বিবেচ্য। জনগণের আন্তরিক সহযোগিতায় এ রাজ্যের চাষী ও উৎসাহী সকল মানুষের কাছে এই বার্তার মাধ্যমে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ হোক জনপ্রিয় – এই প্রয়াসের সুদূরপ্রসারী সাফল্য কামনায়...

(শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক)
বনমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ

গবেষণা মন্ডল
বন দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জুন, ২০২২

বার্তা

জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের অবদান অনস্বীকার্য। ভেষজ উদ্ভিদ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিতস্বরূপ। আদি থেকে আধুনিক – লোকায়ত ভারতে রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু, সভ্যতার আধুনিকীকরণের সাথে সাথে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে অনেক মূল্যবান উদ্ভিদ হারিয়েছে তাদের আবাসস্থল এবং বহু প্রজাতি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে, স্বাস্থ্যরক্ষায় যাদের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ সম্ভার এ রাজ্যের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। বর্তমানে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারেও উর্দ্ধমুখী। রাসায়নিক ঔষধের দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব মানুষকে অনেক বেশী অসহনীয় করে তুলেছে, ফলস্বরূপ মুনাফা অর্জনকারী সংস্থাগুলির কাছেও ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা এখন অনেক বেশী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দফতরের সম্প্রতি অনুধাবন থেকে খুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ যথেষ্ট লাভজনক এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। পরিচর্যা ও ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে খোলা জায়গায়, বাগানে, পতিত জমিতে বা রাস্তার পাশেও ভেষজ উদ্ভিদের চারা রোপণ করে মহামূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব। এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই বন দফতরের অরণ্য পালন (দক্ষিণ) বিভাগ ভেষজ উদ্ভিদের চাষ আবাদ সম্পর্কিত সংকলন "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ" প্রকাশনায় উদ্যোগী হয়েছে। এই সংকলনে চাষ সংক্রান্ত আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসেব একক ফসল ও সংযুক্ত ফসল চাষের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যা জনমুখী প্রকল্প হিসেবে

গুনাগুণ বিকৃত হচ্ছে। পরিকল্পিত চাষ থেকে ভেষজ উদ্ভিদের যোগান যেমন আশানুরূপ নয়, ঠিক তেমনই সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক উপায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে বনৌষধি সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলি সংরক্ষণের কথাও ভাবা হয় না।

এমতাবস্থায়, এই সংকটকালে ভেষজ উদ্ভিদের পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ সংক্রান্ত তথ্যাবলী নথিভুক্ত করে খরচ ও লাভের আনুপাতিক হিসেব সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ বন দফতরের অরণ্য পালন (দক্ষিণ) বিভাগ থেকে "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ" পুস্তকটি মুদ্রিত করা হয়েছে। এই বইটি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়ে কৃষক ও আগ্রহী সকলকে ভেষজ উদ্ভিদ চাষের বার্তা প্রেরণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ভেষজ উদ্ভিদ চাষ লাভজনক ও মানব স্বাস্থ্যের সহায়কও বটে। একাধিক ফসলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ এর বর্ণনা সহ এই সংকলন জনপ্রিয়তা অর্জন করবে – এই ঐকান্তিক প্রয়াসের সার্থকতা হোক আশাব্যঞ্জক।

(বিনোদ কুমার যাদব, আই.এফ.এস.)
মুখ্য বনপাল
গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়ন
বন দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বার্তা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা প্রণালীর কারণে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক চাপ ক্রমশই বাড়ছে। এর ফলস্বরূপ মানুষকে বিভিন্ন রকম রোগের শিকার হতে হচ্ছে। বর্তমানে নিয়মিত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবনের কারণে মানুষকে বিভিন্ন ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচারের অভাবে দিনে দিনে তার গুরুত্ব হারিয়েছে। মানুষ প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আজ বিস্মৃত প্রায়, ফলাফল স্বরূপ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও দীর্ঘকালীন কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে সামনে আসার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদজাত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সেজন্য ঝাড়গ্রাম সন্নিকটে আমলাচটিতে একটি ভেষজ উদ্যান তৈরী করা হয়েছে যেখানে একটি জায়গায় ৮০০ প্রজাতির বেশী ভেষজ উদ্ভিদের বাগান তৈরী করা হয়েছে, এবং ঐ বাগানটি ঝাড়গ্রামের একটি বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই পুস্তিকায় কিছু বনৌষধি গাছ ও গুল্মের বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি ও সেগুলো একক ভাবে বা সমবেত ভাবে চাষ করে আর্থিক ব্যয় তথা আয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত ভেষজ বৃক্ষ ও গুল্ম চাষ করে গ্রাম বাংলায় এক অনন্য আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

"বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ" পুস্তিকাটির মাধ্যমে পাঠক পাঠিকা ঔষধি গুল্ম ও বৃক্ষ চাষে আগ্রহী এবং সফল হলে এই প্রকাশনার প্রকৃত সার্থকতা ফুটে উঠবে।

(বিবেক কুমার)
অতিরিক্ত মুখ্যসচিব
বন দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখবন্ধ

সৃষ্টির প্রায় আদিকাল থেকেই গাছ তার ভেষজ এবং অন্যান্য বিশেষ গুণাবলী দিয়ে পৃথিবীর স্পন্দনের আশ্রয় হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। গাছই দিয়েছে জীবন, সমৃদ্ধ করেছে সভ্যতা। সভ্যতার প্রারম্ভে ব্যধি মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল ভেষজ উদ্ভিদ। ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের পরও মানুষ উদ্ভিদের ওপর তার নির্ভরশীলতা কমায় নি। ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। উন্নত দেশের মানুষও আয়ুর্বেদ ও ভেষজ উদ্ভিদজাত ঔষধির প্রতি ক্রমশ আগ্রহী হয়েছে। তাই আমাদের দেশে তো বটেই, বিদেশেও এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

ভেষজ উদ্ভিদের চাষ আবাদ সম্পর্কিত তথ্য, বাজার ব্যবস্থা, গুদামজাত ও প্রক্রিয়াকরণ করার বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্যাবলীর অভাবে এর চাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। অথচ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করলে লাভজনক ফলন পাওয়া অসম্ভব নয়। সঠিক উপায়ে চাষ না হওয়ার জন্য বাজারে কাঁচামালের যথেষ্ট অভাব আছে, তাই বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ভেষজ ঔষধি উৎপাদনে আগ্রহী হলেও সফল হতে পারছে না।

বন দফতরের অনুধাবন থেকে এটা সুস্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিতে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা অত্যন্ত প্রবল। দীর্ঘদিন ধরে ভেষজ উদ্ভিদের সামগ্রিক চাহিদার বেশিরভাগই সংগৃহীত হচ্ছে বনজঙ্গল, জলাভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎস থেকে। ওইসব জায়গায় স্বাভাবিক নিয়মে ভেষজ উদ্ভিদ জন্মায়। অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ব্যবহারের ফলে জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে, সে কারণে প্রাকৃতিক উৎসের ঐ ভাণ্ডার ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে আসছে। আর তাই কাঁচামালে ভেজাল মিশিয়ে ভেষজ উদ্ভিদের বর্তমান চাহিদা পূরণের অপচেষ্টা চলছে। নিম্নমানের কাঁচামালের জন্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রকৃত

গুণগত মান ভালো হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। ভেষজ উদ্ভিদ যেকোনো জায়গায় চাষ করা সম্ভব। এমনকি পতিত জমিতেও এর চাষ লাভজনক হতে পারে। নিয়মিত ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অর্থকরী কৃষিজ পণ্যের সমতুল হিসেবে ভবিষ্যতে নিজস্ব বাণিজ্যিক গুরুত্ব অর্জন করবে, যা অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী।

এই পুস্তকে দশটি বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদের চাষ পদ্ধতি ও সম্ভাব্য আর্থিক আয়, ব্যয় - লাভের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে যা উপযুক্ত প্রসার ও বিপণনের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার আগ্রহী মানুষ ও কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে এই সংকলন প্রকাশের সার্থকতা পরিপূর্ণ হবে।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
ভেষজ উদ্ভিদ চাষের যৌক্তিকতা	৩
অর্জুন	৭
বহেড়া	১১
আমলকি	১৫
হরিতকি	২০
বেল	২৪
কালমেঘ	২৮
হলুদ	৩৪
ঘৃতকুমারী	৩৯
তুলসী	৪৩
অনন্তমূল	৪৮
যৌথ ফসল চাষ	৫১
তথ্যপঞ্জী	৬০

ভূমিকা

স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিচর্যায় ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহারের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন ও ঘটনাবহুল। ভেষজ ওষুধের অবদান ও গুরুত্বকে অস্বীকার করে আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধের বর্তমান অবস্থানকে ব্যাখ্যা করা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীতে মানব অস্তিত্ব বজায় রাখতে ভেষজ ওষুধ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার কারণে ভেষজ ওষুধের উপযোগিতা বিলুপ্ত প্রায় বলে অনেকে মনে করলেও সে ধারণা দিনে দিনে ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। ভেষজ ওষুধ আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী। অনেক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধই সরাসরি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য এবং সেসব থেকে নিষ্কাশিত রাসায়নিক উপাদান থেকে তৈরী হয়ে থাকে।

ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ ও বিশ্ববাজারে লাভজনক ফসল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখলের সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ বন দফতরের অরণ্যপালন (দক্ষিণ) শাখা থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে এমন কিছু ঔষধি বৃক্ষ ও গুল্ম প্রজাতি নির্বাচন করে তাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের পদ্ধতি, ব্যয় ও আয়ের পরিসংখ্যান সহ ব্যয় এবং লাভের অনুপাত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। NMPB (National Medicinal Plants Board) অর্থাৎ জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ তহবিলের সহায়তায়, উক্ত বিভাগ থেকে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ' পুস্তিকাটি সফলভাবে মুদ্রণ ও প্রকাশনা করা সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় জলবায়ুতে প্রচুর লতা-গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ জন্মায় যা মূলতঃ বন-জঙ্গলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষ লাভজনক এবং পরিবেশ বান্ধব। জৈব সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করলে উদ্ভিদজাত রাসায়নিকের

ভেষজ উদ্ভিদ চাষের যৌক্তিকতা

ভেষজ ওষুধ বা আয়ুর্বেদ বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মানুষের সার্বিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ভেষজ উদ্ভিদ জাত কাঁচামালের চাহিদা উর্দ্ধমুখী। এই সম্পর্কিত সত্য অনুধাবন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই গুরুত্ব আরোপ নিঃসন্দেহে বনৌষধি বা ভেষজ ওষুধের কার্যকারিতার উপযোগিতাকে মূল্যবান বলে নিশ্চিত করে এবং ভেষজ ওষুধ যে যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে।

ভেষজ ওষুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ উৎস থেকে সংগ্রহ বা আহরণ করা হয়। সাধারণতঃ বনে-জঙ্গল প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকা ঔষধি উদ্ভিদ থেকেই ভেষজ ওষুধের কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে জমিতে চাষ করে ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়, নয়ত একসময় প্রকৃতি ভেষজ উদ্ভিদ শূণ্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া, চাষকৃত ভেষজ উদ্ভিদের গুণগতমান অনেক উন্নত হয়ে থাকে। চাষের আওতায় থাকা উদ্ভিদের উৎপাদন ও সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং সঠিক পদ্ধতিতে তা সংগ্রহ করার সুযোগও থাকে।

বন্য উৎস থেকে সংগৃহীত কাঁচামালের ক্ষেত্রে এ ধরণের নিশ্চয়তা থাকে না। এ ক্ষেত্রে ভুল উদ্ভিদ নির্বাচন ও দ্রব্য সংগ্রহের আশঙ্কা যেমন থাকে তেমনই নিম্নমানের কাঁচামালের সরবরাহেরও সুযোগ থাকে। অসময়ে, অপরিণত অবস্থায় ও ভ্রান্ত পদ্ধতিতে ফসল তোলা হলে তার গুণগত মান সঠিক হয় না।

ভেষজ উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিবেশ বান্ধব। প্রায় সব ভেষজ উদ্ভিদেরই

পরিবেশ বিশুদ্ধকরণের ক্ষমতা রয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন রোগজীবানু বিনাশের ক্ষমতা রাখে। তাই অধিক হারে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ ক্রমশঃ দূষিত হয়ে যাওয়া পরিবেশ বিশুদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম।

অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদ চাষে কৃত্রিম কীটনাশক ও সার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। গুল্ম বা লতা জাতীয় উদ্ভিদ থেকে সারা বছর অথবা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ফসল সংগ্রহ করা যায়। সে জন্য তুলনামূলক ভাবে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে কম বিনিয়োগে অধিক লাভ অর্জন সহজেই সম্ভব।

মাশরুম সহ আরও বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে যা অল্প জায়গায় চাষ করা যায়, তাই ভূমিহীন বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই চাষ বিশেষভাবে উপযুক্ত।

আর্থিক বিশ্লেষণে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অন্য যেকোনো কৃষির চেয়ে বেশী লাভজনক। যে কোনো পতিত জমি বা রাস্তার পাশে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করা সম্ভব বলে এই উদ্ভিদ চাষে বিশেষ যত্নের দরকার খুব একটা হয় না, তাই ভেষজ উদ্ভিদ চাষে ঝুঁকিও কম।

আন্তর্জাতিক বাজারে এর বিশেষ চাহিদা আছে, তাই সঠিক উপায়ে সরকারী সাহায্যে বাজারকরণের ব্যবস্থা করা হলে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ আর্থিক লাভের সহায়ক। সর্বনিম্ন সঠিক বাজার মূল্য সরকারী ভাবে প্রতিটি প্রজাতির উদ্ভিদজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা সম্ভব হলে বিনিয়োগকারী সঠিক বাজার মূল্যে যথেষ্ট লাভ অর্জন করতে পারবেন।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য। ভেষজ উদ্ভিদের বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না, তাই পারিবারিক ভাবে সকলেই এই চাষে অংশগ্রহণ করতে পারে, মজুরের খরচ বাঁচানো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সম্ভব।

দেশে ব্যাপকভাবে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ সম্ভব হলে ভেষজ বা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জনপ্রিয় হবে, ভেষজ ওষুধ সহজলভ্য হবে, ফলে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা ব্যয় কমবে।

বর্তমানে ওষুধ ও ভেষজ প্রসাধনী তৈরির কারখানার সংখ্যা

ক্রমবর্ধমান, সঙ্গত কারণে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। এছাড়া খোলা বাজারে, গ্রামে, গলিতে রাস্তায় ভেষজ উদ্ভিদ বিক্রি হয়। বিভিন্ন কবিরাজ, টোটকা চিকিৎসক, উপজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায় প্রতিদিনই ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করেন যার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তাই যথোপযুক্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ সহ ভেষজ উদ্ভিদ চাষের প্রচার আরও বেশী করে প্রয়োজন যার ভবিষ্যৎ প্রতিফলন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে হবে সুদূর প্রসারী।

অর্জুন

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Terminalia arjuna*

ফ্যামিলি ঃ Combretaceae

বর্ণনা ঃ অর্জুন একটি সুদর্শন বৃক্ষ। অর্জুনের ছাল রূপালি - ধূসর রঙের, খন্ড খন্ড ভাবে উঠে আসে। বৃক্ষের পাতাগুলি বিপরীত, উপবৃত্তাকার – আয়তাকার, মসৃণ, কিনারা খুব সূক্ষ্ম দাঁতযুক্ত।

ফুলগুলি শীর্ষে যৌগিক মঞ্জরীতে বিন্যস্ত থাকে, সাদা অথবা ঘিয়ে রঙের হয়, মঞ্জরিপত্রগুলি পাতার মত হয়। বৃতির ভিতরের দিকে পাতলা রোম থাকে, দাঁত বা অংশ ৫টি ত্রিকোণাকার।

ফলগুলি গাঢ় বাদামি রঙের, শক্ত ডানা বা পক্ষ থাকে।

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে অর্জুন গাছ দেখা যায়। যে কোন প্রকার মাটিতেই জঙ্গলে অর্জুন গাছ সফল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল আসে।

বংশবিস্তার ঃ বীজের সাহায্যে।

বাস্তুসংস্থান ঃ বনে জঙ্গলে, সাধারণতঃ দক্ষিণবঙ্গের শাল জঙ্গলে দেখা যায়।

বীজতলায় চারা তৈরি পদ্ধতি ঃ ফেব্রুয়ারী - এপ্রিল মাসে জঙ্গল থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ সংগ্রহ করে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এভাবে শুকোনো বীজ একবছর পর্য্যন্ত কার্যকরী থাকে। এক কেজি বীজে ৪০০ - ৭০০ টি পর্যন্ত বীজ থাকতে পারে।

ফসল তোলার সময় ঃ ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে অর্জুন গাছের বাকল সংগ্রহ করা উচিত।

নিয়মিত খরচ (প্রতিবছর) ঃ ফসল তোলা ও ফসল শুকনো করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হল —

ফসল তোলার খরচ (১০০টি জন)	২৭০০০/-
ফসল শুকনো করার খরচ (১০টি জন)	২৭০০/-
পরিবহন খরচ	৫০০০/-
মোট খরচ	৩৪,৭০০/-

দশম বছর মোট খরচ = (১,১৯০০০ + ৩৪,৭০০)/-

= ১,৫৩,৭০০/-

দশম বছর লাভ = ২,০০,০০০ – ১,৫৩,৭০০ = ৪৬,৩০০/-

একাদশতম ও তৎ পরবর্তী বছরগুলিতে লাভ=(২,০০,০০০–৩৪,৭০০)/-

=১,৬৫,৩০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩৪৭ : ১৬৫৩ = ১ : ৪.৭

ব্যবহার ঃ ছাল - রক্তপাত বন্ধ করে। অর্জুন ছাল আমাশয়, হৃৎযন্ত্রের দূর্বলতা, জ্বরে সাধারণ টনিক বা বলকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছালের গুঁড়ো মূত্রকারক ও উচ্চ রক্তচাপ নিরাময় করে। এছাড়া রক্তবমি, শ্বেতস্রাব, জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ, কাশি, শুক্রক্ষয়, রক্ত আমাশয়, ক্ষত ও ফোঁড়ায় এর ব্যবহার দেখা যায়।

ফল ঃ বলকারক, হাঁপানি ও হার্নিয়ায় সুফলপ্রদ।

পাতা ঃ পাতার রস কান ব্যাথায় ও ক্ষত বা ঘা হলে ব্যবহার করা হয়।

অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার ৫০ শতাংশ। এক কেজি বীজ থেকে ২০০টি চারা পাওয়া যায়।

সংগৃহীত বীজ ভালো করে বেছে নিয়ে হালকা উষ্ণ জলে ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। বীজের খোসা উঠে গেলে বীজগুলো মাদার বেডে ছড়িয়ে দিয়ে ঝুরো মাটি, গোবর সার ও বালির মিশ্রণ (১ : ১ : ১) দিয়ে ঢেকে দিয়ে তার ওপর খড়ের আবরণ দিতে হবে। দিনে দু'বার জল দেওয়া দরকার। ১৫-২০ দিন পর বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা বেরোনো শুরু হয়। সদ্য অঙ্কুরিত চারা ২-৩ দিন পর পলিপটে স্থানান্তরিত করা হয়, এবং পলিপট বেডের ওপর ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অধিক রোদ বা বৃষ্টিতে চারার ক্ষতি না হয়। বেড নিয়মিত পরিষ্কার রাখা ও বেডে জল দেওয়া খুবই জরুরি।

মাদার বেড তৈরির পদ্ধতি ঃ একটি ১.২০ মিটার × ৫ মিটার ও ১০" গভীর মাটি কেটে বেড বানাতে হবে এবং বেডে বালি ও গোবর সার (২ : ১) মিশিয়ে ভালো করে ভর্তি করে রাখতে হবে। বেডে কোন অবস্থায় যেন জল না জমে সেদিকে নজর দিতে হবে।

চারা লাগানোর পদ্ধতি ঃ চারার উচ্চতা যখন ৬০ সেমি. মত হয় তখন চারা চাষের জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়। রোগ পোকা সংক্রমিত চারা বর্জন করে সুস্থ চারা চাষের জমিতে ২.৫ মিটার × ২.৫ মিটার দূরত্বে আগে থেকে তৈরী করে রাখা গর্তে ((০.৬০ + ০.৪৫) / ২ × ০.৪৫ × ০.৪৫) মি. রোপণ করা হয়। প্রতি হেক্টরে এই হিসেবে ১৬০০ চারা লাগানো যাবে। চারা লাগানোর আগে জমির চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা দরকার যাতে গরু - ছাগলের আক্রমণ এড়ানো যায়। গর্তগুলো এপ্রিল - মে মাসে ২.৪ মিটার × ২.৪ মিটার দূরত্বে খনন করা হয় এবং সূর্যালোকে মাটি যাতে জীবাণুমুক্ত হয় সেজন্য ২০-২৫ দিন অপেক্ষা করা হয়। ২০-২৫ দিন পর গোবরসার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে গর্ত অর্ধেক ভর্তি করা হয়। চারা লাগিয়ে গর্তে পুরো মাটি দেওয়া হয়।

চারা লাগানোর ২৫ দিন পর জৈব সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়া

পরিস্কার করা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি হালকা কুপিয়ে দেওয়া হয় (1st mulching)। ১ মাস পর এই প্রক্রিয়া আবারও প্রয়োগ করা হয় তবে এই সময় জৈবসার প্রয়োগ না করলেও চলে। চারাবাগান নিয়মিত পরিস্কার রাখা জরুরি। মার্চ - জুন মাসে বাগানে যাতে আগুন না লাগে সে জন্য বাগানের চারপাশে ও মাঝ বরাবর ৩ মি. চওড়া করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে (fireline)।

ফলন ঃ এই চারা বাগান সাধারণতঃ ৩-৪ বছর পর্যন্ত যত্ন সহকারে দেখভাল করলে দশ বছর পর থেকে গাছ পিছু সর্বোচ্চ ২-৪ কেজি পর্যন্ত ছাল পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য হতে পারে ৫০০ - ৬০০ টাকা প্রতি কেজি।

চারা তৈরী, বাগান তৈরী, ফলন অনুযায়ী লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি) ঃ

এককালীন নির্ধারিত সর্ব্বোচ্চ খরচ

বিষয়	**খরচ**
নার্সারিতে ২০০০ টি চারা তৈরী	৮,০০০/-
চারা বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	**১,১৯,০০০/-**

সর্বনিম্ন আয় – ১০ বছরে ৪০০টি গাছ সর্বনিম্ন বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ১ কেজি ছাল (শুকনো) পাওয়া যাবে যার সর্বনিম্ন বাজার দর ৫০০ টাকা প্রতি কেজি।

সর্বনিম্ন মোট আয় = (৪০০ × ১ × ৫০০) /- = ২,০০,০০০/-

নিয়মিত খরচ (প্রতিবছর) ঃ ফল তোলা ও ফল শুকনো করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হল —

ফল সংগ্রহ খরচ (১০০টি জন)	২৭০০০/-
ফল শুকনো করার খরচ (১০টি জন)	২৭০০/-
পরিবহন খরচ	৫০০০/-
মোট খরচ	৩৪,৭০০/-

দশম বছর মোট খরচ = (১,১৯০০০ + ৩৪,৭০০)/-

= ১,৫৩,৭০০/-

দশম বছর লাভ = ৩,০০,০০০ – ১,৫৩,৭০০ = ১,৪৬,৩০০/-

একাদশতম ওতৎ পরবর্তী বছরগুলিতে লাভ=(৩,০০,০০০–৩৪,৭০০)/-

= ২,৬৫,৩০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩৪৭ : ২৬৫৩ = ১ : ৭.৬

ব্যবহার ঃ

১) ছাল – মূত্রকারক, শ্বেতীরোগে ছাল বেটে প্রয়োগ করা যায়। দৈনিক দূর্বলতায় ছালের ক্বাথ গোলমরিচ সহযোগে সেবন করলে উপকার হয়।

২) ফল – জ্বরনাশক, সংকোচক, বিবেচক ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। এছাড়া নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁপানি, আমাশয়, ডায়েরিয়া, শোথ, চোখের রোগ, শ্বেতী, প্রদাহ ও ফোলায় এটি ব্যবহৃত হয়। আমলকি, হরিতকী ও বহেড়া ফল (ত্রিফলা) থেঁতো করে সাধারণত জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জল খালি পেটে নিয়মিত খেলে অজীর্ণ রোগ নিরাময় হয়।

বহেড়া

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Terminalia bellerica*

ফ্যামিলি ঃ Combretaceae

বর্ণনা ঃ একটি মাঝারি আকারের বৃক্ষ, ডালপালা ছড়ানো অবস্থায় থাকে. ছাল রূপালি, ধূসর রঙের। পাতাগুলি সাধারণত শাখার অগ্রভাগে গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। একান্তর, মসৃণ, কচি অবস্থায় রোমযুক্ত, ফুলগুলি কাক্ষিক অনিয়তাকার মঞ্জুরিতে অবস্থিত থাকে। মঞ্জুরিদন্ড সরু, ফুল সবুজের আভাযুক্ত হলুদ রঙের। বৃতির নলের বাইরের দিক রোমশ, ভেতরটা পাতলা ও ঘন রোমে ঢাকা, দাঁত বা অংশ ৫টি, পুংকেশর ১০টি, বাইরে বেরিয়ে থাকে। ফল ডিম্বাকার, ধূসর রঙের, নরম রোমযুক্ত, হালকাভাবে ৫টি খাঁজ থাকে।

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র উষ্ণতর অঞ্চল।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ নভেম্বর – ফেব্রুয়ারি

বংশবিস্তার ঃ বীজের সাহায্যে।

বাস্তুসংস্থান ঃ বনে জঙ্গলে সাধারণত দক্ষিণবঙ্গের শাল জঙ্গলে দেখা যায়।

চারা তৈরী করার পদ্ধতি ঃ ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসে জঙ্গল থেকে বীজ সংগ্রহ করে নার্সারিতে চারা তৈরী করা হয়।

প্রথমে সংগৃহীত বীজ ভাল করে বেছে, রোদে দিয়ে (২-৩ দিন) চটের বস্তায় বেঁধে ৪৮ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে বীজের গায়ের খোসা ছাড়িয়ে আগে থেকে তৈরী করে রাখা মাদার বেডে ছড়িয়ে দিয়ে হালকা গোবরসার গুড়া মাটি ও বালির মিশ্রণ তার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর খড় ঢাকা দেওয়া হয়।

মাদার বেড তৈরী করার পদ্ধতি ঃ একটি ১.২০ মিটার × ৫ মিটার × ১০" গভীর মাটি কেটে বেড বানানো হয় এবং বেডে বালি ও গোবর সার মিশ্রণ ভাল করে ভর্তি করে রাখা হয়। বেডে যেন কোন অবস্থায় জল জমে না থাকে। ১ কেজি পরিমাণ বীজে ১০০ - ১২০ টা মতো বীজ পাওয়া যায়।

তবে ১ কেজি বীজ থেকে ৫০ - ৬০ টি চারা হবার সম্ভাবনা আছে। বীজ ফেলার ২০ - ২৫ দিন পর অঙ্কুরোদগম হতে শুরু করে।

সদ্য অঙ্কুরিত চারা ২ - ৩ দিন পর পলিপটে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পলিপট বেডের উপর ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে রোদের তাপে চারা মারা না যায়। বেড পরিস্কার রাখা ও নিয়মিত জল দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চারার উচ্চতা ১ - ১.৫ ফুট হলে জুলাই মাসে বর্ষার সময় বাগানে / জঙ্গলে চারা লাগানো হয়।

চারা লাগানোর পদ্ধতি ঃ ২.৫ মিটার × ২.৫ মিটার ছাড়া বহেড়া চারা লাগানো হয়। অর্থাৎ ১৬০০ চারা প্রতি হেক্টরে লাগানো হয়। চারা লাগানোর আগে জঙ্গল / বাগান ভাল করে পরিস্কার করে বেড়া দিতে হবে, যাতে গরু - ছাগলে চারা নষ্ট না করে। চারা লাগানোর গর্তের আকার ((০.৬০ + ০.৪৫) / ২ × ০.৪৫ × ০.৪৫) মিটার। ২০ - ২৫ দিন পর জৈব সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

চারা লাগানোর ২৫ দিন পর জৈবসার প্রয়োগ করে গাছের গোড়া পরিস্কার করে কোদাল দিয়ে মাটি ওলোট পালোট করে দেওয়া হতে থাকে যাকে আমরা Mulching বলে থাকি। আবার ২ মাস পরে দ্বিতীয় বার বা 2nd Mulching করা হয়। তবে এই সময় জৈব সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না।

চারাবাগান নিয়মিত পরিস্কার করা এবং মার্চ - জুন মাস পর্যন্ত যাতে বাগানে আগুন না লাগে সেই বিষয়ে খুব নজর রাখা প্রয়োজন।

আগুন লাগার সমস্যা দূর করার জন্য আমরা বাগানের চারপাশে এবং মাঝ বরাবর ৩ মিটার চওড়া করে ভাল করে ঘাস পরিস্কার করে দেওয়া উচিত (Fireline)।

ফলন ঃ এই চারা বাগান সাধারণত তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত খুব যত্ন সহকারে দেখভাল করলে দশ বছর পর থেকেই গাছ পিছু সর্ব্বোচ্চ ৪০ - ১০০ কেজি পর্যন্ত বীজ পাওয়া যায়। সংগৃহীত পরিপক্ক বীজের বাজার মূল্য ৩৫ - ৪০ টাকা প্রতি কেজি।

চারা তৈরী, বাগান তৈরী, ফলন অনুযায়ী লাভের হিসেব (প্রতি কেজি) ঃ

এককালীন নির্ধারিত সর্ব্বোচ্চ খরচ

বিষয়	**খরচ**
নার্সারিতে ২০০০ টি চারা তৈরী	৮,০০০/-
চারা বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	**১,১৯,০০০/-**

সর্বনিম্ন আয় – ১০ বছরে ৪০০টি গাছ সর্বনিম্ন বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ২৫ কেজি ফল পাওয়া যাবে যার সর্বনিম্ন বাজার দর সর্বনিম্ন ৩০ টাকা প্রতি কেজি।

ফল তোলার সময় ঃ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস

আমলকি

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Phyllanthus emblica*

ফ্যামিলি ঃ Phylanthaceae

বর্ণনা ঃ সরু ডালপালাযুক্ত বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। যৌগিক পত্র, একান্তর ও দুটি সারিতে বিন্যস্ত, সরু প্রশাখাগুলিতে পক্ষল যৌগিকরূপে সজ্জিত, পত্রকগুলি ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ রঙের, সহবাসী অর্থাও পুরুষ ও স্ত্রী ফুল একই গাছে জন্মায়। স্ত্রী ফুলের তুলনায় পুরুষ ফুলের সংখ্যা অনেক বেশী হয় এবং কান্ডের উপরিভাগে থাকে। কাক্ষিক, পুষ্পপুট সরল। পুং পুষ্পের বৃতি ৪ - ৬ টি, মুক্ত অথবা কিছুটা যুক্ত থাকে, পুষ্পাধার গ্রন্থিযুক্ত, পুংকেশর ৩ টি। স্ত্রী পুষ্পের বৃতি পুংকেশরের মত,

গর্ভকেশর তিনটি কোষযুক্ত গর্ভাশয়ের সঙ্গে যুক্ত। ফল গুলি বড় আকারের, রসাল, ৩টি হাড়ের মত শক্ত ২টি প্রকোষ্ঠ যুক্ত অংশ থাকে।

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে আমলকি চাষ করা যায়। দোঁআশ মাটি এই গাছের জন্য উপযুক্ত লাল মাটিতেও জন্মায় তবে জল জমা জায়গায় আমলকি চাষ অসম্ভব। অত্যন্ত গরম বা উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা আমলকির আছে। বৃষ্টিপাত ভালো হলে ফলনও ভালো হয়। উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া সর্বোপরি উপযুক্ত।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ নভেম্বর থেকে মার্চ।

বংশবিস্তার ঃ বীজের সাহায্যে, কলমের সাহায্যে।

বাস্তুসংস্থান ঃ পর্ণমোচী অরণ্যে জন্মায়। এখন অরণ্যে কম দেখা যায়।

বীজতলায় চারা তৈরী ঃ নভেম্বর থেকে মার্চ মাসে ফল পাকার পর গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়। ফলের মাংসল অংশ অপসারণ করে শক্ত আবরণ সহ

ফলন ঃ এই চারা বাগান তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত খুব যত্ন সহকারে দেখভাল করলে পাঁচ বছর পর থেকে ফল পাওয়া যায়, তবে অর্থকরী ফসল হিসাবে ৭ বছর (কলমের গাছ) ও তার পর থেকে

ফল সংগ্রহ করা উচিত। ৭ - ১০ বছর বয়সের গাছ থেকে ৭ কেজি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। আমলকি ফলের ওষধি গুণ থাকায় বাজারে এর ভালো চাহিদা আছে। সংগৃতীহ ফলের বাজার মূল্য ১০০ - ১২০ টাকা প্রতি কেজি। কলমের গাছ থেকে ১২ থেকে ১৫ কেজি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

চারা তৈরী, বাগান তৈরী, ফলন অনুযায়ী লাভের হিসেব (প্রতি হেক্টর) ঃ

এককালীন নির্ধারিত সর্ব্বোচ্চ খরচ

বিষয়	খরচ
নার্সারিতে ২০০০ টি চারা তৈরী	৮,০০০/-
চারা বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	**১,১৯,০০০/-**

সর্বনিম্ন আয় – ৭ - ১০ বছরে ৬০০ টি গাছ সর্বনিম্ন বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ৪ কেজি ফল পাওয়া যাবে যার সর্বনিম্ন বাজার দর সর্বনিম্ন ১০০ টাকা প্রতি কেজি।

সর্বনিম্ন মোট আয় = (৬০০ × ৪ × ১০০) /- = ২,৪০,০০০/-

ফসল তোলার সময় ঃ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস

নিয়মিত খরচ (প্রতিবছর) ঃ ফল তোলা ও ফল সংগ্রহ করার জন্য

বীজ রোদে ২ - ৩ দিন শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর বীজগুলিকে সংরক্ষণ করা যায় যা প্রায় দুই মাস পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। এক কেজি বীজে সর্বোচ্চ ৬০,০০০ বীজ থাকতে পারে। মোটামুটি ৪০,০০০ - ৪৫,০০০ বীজ এক কেজিতে পাওয়া যায়। বীজ থেকে চারা নির্গমনের হার ৪০%। সংগৃহীত বীজ ভালো করে বেছে নিয়ে ১২ ঘন্টা ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। বীজের পাতলা খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে মাদার বেডে বীজগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হালকা গোবর সার, গুঁড়ো মাটি ও বালির মিশ্রণ তার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে খড় ঢাকা দেওয়া হয়। দিনে দু বার জল দেওয়া জরুরী।

২০ - ২৫ দিন পর বীজ থেকে চারা নির্গত হলে সদ্য অঙ্কুরিত চারা ৩ - ৪ দিন পর পলিপটে (৪" × ৬") স্থানান্তরিত করা হয়। পলিপটে ঝুরো মাটি গোবরসার ও বালি ১ : ১ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে ভরে রাখতে হবে। গোবর সারের জায়গায় নিম খোল বা সর্ষে খোল ব্যবহার করা যেতে পারে। পলিপট বেডের ওপর ছায়াদানের ব্যবস্থা রাখতে রাখতে হবে যাতে অধিক রোদ বা বৃষ্টিতে চারার ক্ষতি না হয়। বেড পরিস্কার রাখা ও দিনে অন্তত দু'বার চারায় জল দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মাদার বেড তৈরীর পদ্ধতি ঃ একটি ১.২০ মি. × ৫ মি. × ১০" ইঞ্চি গভীর মাটি কেটে বেড বানানো হয় এবং বেডে বালি ও গোবরসার মিশ্রণ (২ : ১) ভালো করে ভর্তি করে রাখা হয়। বেডে যেন কোন অবস্থাতেই জল না জমে থাকে।

কলমের চারা তৈরী ঃ জোড়কলম পদ্ধতিতে আমলকি গাছে সাফল্য পাওয়া যায়। নার্সারিতে তৈরী ১ - ১.৫ বছরের গাছ কে স্টক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। রোগ মুক্ত ও সবুজ, সফলভাবে বেড়ে ওঠা স্টক গাছের গোড়া থেকে ১৫ - ২০ সেমি ওপরে কলম করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে জোড়া স্থানের

নীচে যেন কিছু পাতা অবশ্যই থাকে। এবার নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্টক গাছের মাথাটি সমভাবে কেটে অপসারণ করতে হবে। স্টক গাছের মাথাটি ২ - ৩ সেমি. লম্বালম্বি চিরে দিতে হবে এবং সায়নের গোড়ার উভয় পাশে একই ভাবে ২ - ৩ সেমি. তির্যক কাট দিতে হবে। এবার স্টক গাছের কর্তিত অংশে সায়নের কর্তিত অংশ সমান ভাবে প্রবিষ্ট করাতে হবে। অতঃপর জোড়া লাগানো জায়গাটি পলিথিন ফিতে দিয়ে শক্তভাবে পেঁচিয়ে বাঁধতে হবে। কলম করা গাছে অতিরিক্ত রোদ ভালো নয়, হালকা ছায়া প্রয়োজন। স্টক গাছে অনাকাঙ্খিত কুশি এলে, তা ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রায় ৩ মাস পর পলিথিন ফিতেটি খুলতে হবে। তখন জোড়াটি স্থায়ী হয়ে যাবে। চারার বৃদ্ধি কম হলে ইউরিয়া (২ গ্রাম / ১ লিটার জল) পাতায় স্প্রে করতে হবে। রোগ - পোকা থেকে বিশেষভাবে সাবধান থাকা জরুরী।

চারা লাগানোর পদ্ধতি ঃ চারার উচ্চতা ৬০ সেমি. মত হলে চারা চাষের জমিতে লাগানোর জন্য উপযুক্ত হয়। রোগ পোকা সংক্রমণ মুক্ত চারা বাছাই করে চাষের জমিতে লাগানোর জন্য নিতে হবে। মাঠে ২.৫ মি.× ২.৫ মি. দূরত্বে গর্ত ((০.৬০ + ০.৪৫) / ২ × ০.৪৫ × ০.৪৫) মি. খুঁড়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি, বর্ষার সময়ে চারা লাগানো হয়। গর্ত সাধারণতঃ এপ্রিল - মে মাসে খুঁড়ে রাখা হয় যাতে সূর্যের তাপে মাটি জীবাণুমুক্ত হতে পারে। গর্ত খোঁড়ার ২০ - ২৫ দিন পর, জৈবসার ও কীটনাশক সহ মাটি দিয়ে গর্ত অর্ধেক ভর্তি করে রাখা হয়। চারা লাগানোর ২৫ দিন পর জৈবসার প্রয়োগ করে, গাছের গোড়া পরিস্কার করে, মাটি হালকা কুপিয়ে দেওয়া হয় (Mulching)। ১ মাস পর এই প্রক্রিয়া আবারও প্রয়োগ করা হয়, তবে এ সময় জৈব সার না দিলেও চলে। চারা বাগান নিয়মিত পরিস্কার করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলোয় গ্রীষ্মকালে (এপ্রিল - জুন) বাগানে যাতে কোন ভাবেই আগুন না লাগে সেদিকে বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন। চারা বাগান কে বেড়া সহ নিরাপদ রাখা জরুরি। আগুন লাগার সমস্যা কম করার জন্য বাগানের চারপাশ ও মাঝ বরাবর ৩ মি. চওড়া করে আগাছা সম্পূর্ণ পরিস্কার করা হয়ে থাকে (Fireline)।

জরুরি। মার্চ - জুন মাসে বাগানে যাতে আগুন না লাগে সে জন্য বাগানের চারপাশে ও মাঝ বরাবর ৩ মি. চওড়া করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে (fireline)।

ফলন ঃ এই চারা বাগান ৩ - ৪ বার রক্ষণাবেক্ষণের পর দশ বছর পর থেকে গাছ পিছু ৫০ - ৮০ কেজি বীজ / ফল পাওয়া সম্ভব যার বাজার মূল্য ৩০ - ৪০ টাকা প্রতি কেজি। হরিতকির ঔষধি গুনের জন্য বাজারে এর চাহিদা উর্দ্ধমুখী। দশ বছর পর্যন্ত ২০০ টি গাছ প্রতি হেক্টরে বাঁচানো সম্ভব হলে যথাযোগ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী।

চারা তৈরী, বাগান তৈরী, ফলন অনুযায়ী লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি) ঃ

এককালীন নির্ধারিত সর্ব্বোচ্চ খরচ

বিষয়	**খরচ**
নার্সারিতে ২০০০ টি চারা তৈরী	৮,০০০/-
চারা বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	**১,১৯,০০০/-**

সর্বনিম্ন আয় – ১০ বছরে ৪০০টি গাছ সর্বনিম্ন বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ২৫ কেজি ফল পাওয়া যাবে যার সর্বনিম্ন বাজার দর সর্বনিম্ন ৩০ টাকা প্রতি কেজি।

ফল তোলার সময় ঃ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস

নিয়মিত খরচ (প্রতিবছর) ঃ ফল তোলা ও ফল শুকনো করার জন্য

নিম্নলিখিত ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হল —

ফল তোলা ও সংগ্রহ খরচ (১০০টি জন)	২৭০০০/-
পরিবহন খরচ	৫০০০/-
মোট খরচ	৩২,০০০/-

দশম বছর মোট খরচ = (১,১৯০০০ + ৩২,০০০)/-

= ১,৫১,০০০/-

দশম বছর লাভ = ২,৪০,০০০ – ১,৫১,০০০ = ৮৯,০০০/-

একাদশতম ও তৎ পরবর্তী বছরগুলিতে লাভ=(২,৪০,০০০–৩২,০০০)/-

= ২,০৮,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩২০ : ২০৮ = ১ : ১.৫ (প্রায়)

ব্যবহার ঃ

ফল – বমি, পিত্তজনিত রোগ, কুষ্ঠ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রদাহ, ত্বকে জ্বালা, অর্শ, রক্তাল্পতা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা - যন্ত্রণা, শ্বেতস্রাব, পিত্তজনিত পেট ব্যাথা, চোখের রোগ ইত্যাদি সকল সমস্যায় ব্যবহৃত হয়।

হরিতকী ও বহেড়ার সঙ্গে আমলকির (ত্রিফলা) ফল সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে খালি পেটে সেই জল নিয়মিত খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। এটি অজীর্ণ রোধেও উপকারী। জন্ডিসে টাটকা ফল ও মূল বেটে খাওয়ানো হয়। পাকা ফল লবণের সঙ্গে খাওয়ালে শিশুদের উদরাময় সারে।

পাতা – চক্ষুরোগে উপকারী।

মূল – আমলকী মূলের সঙ্গে পলাশ, তেজরাজ, অনন্তমূল, কুমারিকা, শতমূল একসঙ্গে বেটে খেলে যৌন রোগ (অস্বাভাবিক বীর্যপাত) নিরাময় হয়।

হরিতকি

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Terminalia chebula*

ফ্যামিলি ঃ Combretaceae

বর্ণনা ঃ হরিতকি একটি শাখাবহুল বৃক্ষ। বৃক্ষের ছাল ধূসর রঙের, তরুণ অবস্থায় কান্ড রূপালি - ধূসর রঙের। পাতাগুলি প্রায় বিপরীত, উপবৃত্তাকার, পরিণত পাতা মসৃণ, পত্রবৃন্ত রোম দিয়ে ঢাকা থাকে।

ফুলগুলি উভলিঙ্গ, শীর্ষে অনিয়ত যৌগিক মঞ্জরিতে বিন্যস্ত থাকে. সাদাটে বা হলুদের আভাযুক্ত সাদা রঙের। বৃতি প্রায় ঘন্টাকার, দাঁতের অংশ ৪টি।

ফল ডিম্বাকার. পাকলে কমবেশি ৪ টি খাঁজ বা দাগ দেখা যায়। আঁটি শক্ত হাড়ের মত, আয়তাকার।

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গের উষ্ণতর সমগ্র অঞ্চলে হরিতকি গাছ দেখা যায়।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ নভেম্বর - এপ্রিল

বংশ বিস্তার ঃ বীজের সাহায্যে

বাস্তুসংস্থান ঃ বনে, জঙ্গলে, সাধারণতঃ দক্ষিণবঙ্গের শাল জঙ্গলে হরিতকি গাছ দেখা যায়।

বীজতলায় চারা তৈরির পদ্ধতি ঃ এপ্রিল - মে মাসে জঙ্গল থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা ২ - ৩ দিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এভাবে শুকনো বীজ এক বছর পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। এক কেজি বীজে ১৪০ - ১৫০ টা মত বীজ থাকে। এক কেজি বীজ থেকে সর্ব্বোচ্চ ৭০ টি চারা পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, অঙ্কুরোদমের হার শতকরা ৫০ - ৫৫%। সংগৃহীত বীজ ভালো করে বেছে নিয়ে হালকা গরম জলে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভেজানো বীজের

খোসা ছাড়িয়ে তা মাদার বেডে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাদার বেড আগে থেকে তৈরী করে রাখা হয়। মাদার বেডে বীজ ছড়িয়ে বালি ও গোবর সার (২ : ১) মিশ্রণ চাপা দিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দিনে দুবার জল দিতে হয়। ২০ - ৩০ দিন পর বীজ থেকে চারা নির্গমন হতে শুরু করে। সদ্য অঙ্কুরিত চারা ২ - ৩ দিন পর পলিপটে (৪" × ৬") স্থানান্তরিত করা হয়। পলিপটে বেডের ওপর ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে অতিরিক্ত রোদ বা বৃষ্টিতে চারার ক্ষতি না হয়। বেড নিয়মিত পরিস্কার রাখা ও বেডে জল দেওয়া খুবই জরুরি বিষয়।

মাদার বেড থেকে চারা লাগানো ঃ চারার উচ্চতা যখন ৬০ সেমি. মত হয় তখন চারা চাষের জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়। রোগ পোকা সংক্রমিত চারা বর্জন করে সুস্থ চারা চাষের জমিতে ২.৪ মিটার × ২.৪ মিটার দূরত্বে আগে থেকে তৈরী করে রাখা গর্তে ((০.৬০ + ০.৪৫) / ২ × ০.৪৫ × ০.৪৫ মিটার) রোপণ করা হয়। প্রতি হেক্টরে এই হিসেবে ১৬০০ চারা লাগানো যাবে। চারা লাগানোর আগে জমির চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা দরকার যাতে গরু - ছাগলের আক্রমণ এড়ানো যায়। গর্তগুলো এপ্রিল - মে মাসে ২.৪ মিটার × ২.৪ মিটার দূরত্বে খনন করা হয় এবং সূর্যালোকে মাটি যাতে জীবাণুমুক্ত হয় সেজন্য ২০-২৫ দিন অপেক্ষা করা হয়। ২০-২৫ দিন পর গোবরসার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে গর্ত অর্ধেক ভর্তি করা হয়। চারা লাগিয়ে গর্তে পুরো মাটি দেওয়া হয়।

চারা লাগানোর ২৫ দিন পর জৈব সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়া পরিস্কার করা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি হালকা কুপিয়ে দেওয়া হয় (1st mulching)। ১ মাস পর এই প্রক্রিয়া আবারও প্রয়োগ করা হয় তবে এই সময় জৈবসার প্রয়োগ না করলেও চলে। চারাবাগান নিয়মিত পরিস্কার রাখা

চারা লাগানোর ২৫ দিন পর জৈব সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়া পরিস্কার করা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি হালকা কুপিয়ে দেওয়া হয় (1st mulching)। ১ মাস পর এই প্রক্রিয়া আবারও প্রয়োগ করা হয় তবে এই সময় জৈবসার প্রয়োগ না করলেও চলে। চারাবাগান নিয়মিত পরিস্কার রাখা জরুরি। মার্চ - জুন মাসে বাগানে যাতে আগুন না লাগে সে জন্য বাগানের চারপাশে ও মাঝ বরাবর ৩ মি. চওড়া করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে (fireline)।

ফলন ঃ এই চারা বাগান ২ - ৩ বছর রক্ষণাবেক্ষণের পর দশ বছর ও তার পরের বছর গুলোয় গাছ পিছু ১৫০ - ২০০ টি ফল পাওয়া সম্ভব, যার বাজার মূল্য ৮ - ১০ টাকা প্রতি ফল। বেলের ঔষধিগুণ থাকার জন্য বাজারে ফলের যথেষ্ট চাহিদা আছে। দশ বছরে হেক্টর প্রতি ২০০ টি গাছ বাঁচানো সম্ভব হলে যথাযোগ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী।

চারা তৈরী, বাগান তৈরী, ফলন অনুযায়ী লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি) ঃ

এককালীন নির্ধারিত সর্ব্বোচ্চ খরচ

বিষয়	**খরচ**
নার্সারিতে ২০০০ টি চারা তৈরী	৮,০০০/-
চারা বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	**১,১৯,০০০-**

নিম্নলিখিত ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হল —

ফল সংগ্রহ খরচ (১০০টি জন)	২৭০০০/-
ফল শুকনো করার খরচ (১০টি জন)	২৭০০/-
পরিবহন খরচ	৫০০০/-
মোট খরচ	৩৪,৭০০/-

দশম বছর মোট খরচ = (১,১৯০০০ + ৩৪,৭০০)/-

= ১,৫৩,৭০০/-

দশম বছর লাভ = ৩,০০,০০০ – ১,৫৩,৭০০ = ১,৪৬,৩০০/-

একাদশতম ওতৎপরবর্তী বছরগুলিতে লাভ=(৩,০০,০০০–৩৪,৭০০)/-

= ২,৬৫,৩০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩৪৭ : ২৬৫৩ = ১ : ৭.৬

ব্যবহার ঃ

ফল – পুষ্টি নিয়ন্ত্রক, সংকোচক ও বিরেচক। এটি কোষ্ঠবদ্ধতায়, পাকস্থলির সমস্যায় ও দৈহিক দূর্বলতায় টনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্শ, পিত্তজনিত ব্যাথা, চর্মরোগ, পিত্তপাথুরি, চোখ ওঠা ইত্যাদি সমস্যায় ব্যবহৃত হয়। শুকনো ফলের গুঁড়ো খাওয়ার আগে খেলে বদহজম বা অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমলকি ও বহেড়ার সঙ্গে হরিতকীর ফল থেঁতো করে সারারাত জলে ভিজিয়ে সেই জল সকালে খালি পেটে নিয়মিত পান করলে অজীর্ণ বা বদহজম রোগ নিরাময় হয়। এছাড়া দীর্ঘদিনের আলসার, দাঁত ব্যাথা, কাশি, হাঁপানি, ডায়ারিয়া, আমাশয় ও গ্যাসে এটি হিতকর।

ছাল – মূত্রকারক হিসেবে ও হৃৎযন্ত্রের দূর্বলতায় টনিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বেল

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Aegle marmelos*

ফ্যামিলি ঃ Rutaceae

বর্ণনা ঃ বেল মাঝারি অথবা বড় আকৃতির বৃক্ষ। তরুণ অবস্থায় কান্ডের শক্ত কাঁটা থাকে। পাতা যৌগিক ও ত্রিপক্ষল। পত্রকগুলি উপবৃত্তাকার অথবা লম্বাটে ডিম্বাকার।

ফুল সবজে সাদা, মিষ্টি গন্ধযুক্ত। বৃতির অংশগুলি ৪ - ৫ টি। উপরের দিকে রোঁয়াযুক্ত। পাপড়ি ৪ - ৫ টি। পুংকেশর ৪০ এর বেশি।

ফল গোলকাকার অথবা উপবৃত্তাকার, ফলের বহিস্তবক পীতাভ সবুজ, কাষ্ঠল প্রকৃতির। ফলের শাঁস কমলা অথবা হলুদ। পাকলে মিষ্টি স্বাদযুক্ত। বীজগুলি ছোট, মিউসিলেজ জাতীয় পিচ্ছিল আঠা দ্বারা আবৃত থাকে।

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র অঞ্চলে বেল গাছ দেখা যায়।

বাস্তুসংস্থান ঃ দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলে, রাস্তার ধারে ও বাড়ির বাগানেও বেলগাছ দেখা যায়। পুজোর উপাচার হিসেবে বেলের বিশেষ ব্যবহার আছে, তাই বেল গাছ রোপণের প্রবণতা সার্বিকভাবে লক্ষ্যণীয়।

বীজতলায় চারা তৈরী ঃ এপ্রিল - মে মাসে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে বীজ ছাড়িয়ে নিতে হবে। বীজগুলো ছাই-এর সঙ্গে মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এই সকল বীজ খুব কমদিন কার্যকরী থাকে তাই বীজ সংগ্রহ করে সেই বছরেই বীজ চারা তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে হবে। এক কেজি বীজে

মোটামুটি ৫০০০ টি বীজ থাকে। এক কেজি বীজ থেকে ২০০০ টি চারা তৈরী করা সম্ভব। বীজের অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার ৫৫%।

শুকনো বীজ মাদার বেডে ছড়িয়ে দিয়ে ঝুরো মাটি, বালি ও গোবরসার (১ : ১ : ১)-এর মিশ্রণ দিয়ে চাপা দিতে হবে, তার ওপর খন্ড ছড়িয়ে দিনে দুবার জল দিতে হবে। ১০ - ২০ দিন পর বীজ থেকে চারা নির্গত হলে ২ - ৩ দিন পর সদ্য অঙ্কুরিত চারা পলিপটে (৪" × ৬") স্থানান্তরিত করতে হবে। পলিপট বেডের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অধিক রোদ বা বৃষ্টিতে চারার কোন ক্ষতি না হয়। পলিপট বেড নিয়মিত পরিস্কার রাখা এবং সেখানে নিয়মিত জল দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

মাদার বেড তৈরি ও চারা লাগানোর পদ্ধতি ঃ চারার উচ্চতা যখন ৬০ সেমি. মত হয় তখন চারা চাষের জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়। রোগ পোকা সংক্রমিত চারা বর্জন করে সুস্থ চারা চাষের জমিতে ২.৪ মিটার × ২.৪ মিটার দূরত্বে আগে থেকে তৈরী করে রাখা গর্তে ((০.৬০ + ০.৪৫) / ২ × ০.৪৫ × ০.৪৫ মিটার) রোপণ করা হয়। প্রতি হেক্টরে এই হিসেবে ১৬০০ চারা লাগানো যাবে। চারা লাগানোর আগে জমির চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা দরকার যাতে গরু - ছাগলের আক্রমণ এড়ানো যায়। গর্তগুলো এপ্রিল - মে মাসে ২.৪ মিটার × ২.৪ মিটার দূরত্বে খনন করা হয় এবং সূর্যালোকে মাটি যাতে জীবাণুমুক্ত হয় সেজন্য ২০-২৫ দিন অপেক্ষা করা হয়।

২০-২৫ দিন পর গোবরসার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে গর্ত অর্ধেক ভর্তি করা হয়। চারা লাগিয়ে গর্তে পুরো মাটি দেওয়া হয়।

সেমি. ব্যবধানে কালমেঘের বীজ বুনে হালকা করে মাটি চাপা দিয়ে দিতে হয়। এরপর বিশেষ নজর রাখতে হয় যাতে বীজের অঙ্কুর হওয়ার পর ছোট চারা যেন আগাছায় ঢেকে না যায়। যে সব এলাকায় আগাছার বাড় বেশী সেখানে সরাসরি বীজ না বোনাই ভাল। নার্সারিতে বীজতলায় চারা তৈরি করে, একটু বড় চারা ৩০ সেমি. ব্যবধানে লাইন ফেলে প্রতি লাইনে ১৫ সেমি. দূরে দূরে লাগানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে চারা লাগানোর পরেই একবার সেচ দিতে হবে এবং বিকালের দিকে জুলাই মাসের বর্ষায় চারা লাগাতে হবে।

জমিতে চারা লাগানোর ২০ থেকে ৩০ দিন ব্যবধানে আগাছা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। এছাড়া খুব ভাল ফলন পেতে জমিতে পরিমাণ মতো সার দিলে ভাল হয়। তারপর ১ সপ্তাহ পরপর সেচ দেওয়া উচিৎ। এরপর খরার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। কালমেঘ চাষে সে রকম ক্ষতিকারক রোগ বা পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ দেখা যায়নি।

চারা লাগানোর ৩ থেকে ৪ মাস পরেই গাছের কান্ড মাটি থেকে ১০ বা ১৫ সেমি. রেখে উপরের পাতা সহ ডালপালা কেটে নেওয়া চলে। নিয়মিত সেচ ও পরিচর্যায় থেকে যাওয়া কান্ডে আবার নতুন ডাল-পাতা গজিয়ে যাবে এবং তা প্রথম ফসল কাটার ৬০ দিন পরই কেটে নেওয়া চলে। এভাবে বছরে দুই থেকে তিনবার একই জমিতে পাতা সহ কালমেঘের ডালপালা কেটে নেওয়া যাবে। ফসল কাটতে হবে রোদের দিনে। কেটে নেওয়া পাতা ও ডালপালা পাতলা করে ছায়ায় শুকোতে হবে একটা ত্রিপল এর উপর, যাতে বাইরের কোন নোংরা শুকনো ঝরা পাতা কালমেঘের সাথে না মেশে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশির বা জল না লাগে। এইভাবে শুকোতে পারলে সবুজ রঙই থেকে যাবে। এক হেক্টর জমি প্রতি ২ - ২.৫ টন কালমেঘ (ছায়ায় শুকনো) পাওয়া যাতে পারে। সেচ না দিতে পারলে চারা লাগানোর ৬ মাস পরে গোটা গাছই কেটে নেওয়া যাতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে থাকা শাল জঙ্গল / ভেষজ গাছের বাগানের মধ্যে আন্তঃফসল রূপে কালমেঘ চাষ ঃ দক্ষিণবঙ্গে বিদ্যমান শাল জঙ্গলগুলিতে বা নতুন করে

সর্বনিম্ন আয় – ১০ বছরে ৪০০ টি গাছ সর্বনিম্ন বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ১২০ টি ফল পাওয়া যাবে যার সর্বনিম্ন বাজার দর সর্বনিম্ন ৮ টাকা প্রতি ফল।

সর্বনিম্ন মোট আয় = (৪০০ × ১২০ × ৮) /- = ৩,৮৪,০০০/-

ফসল তোলার সময় ঃ ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসে ফল পাকে। ফল সংগ্রহ করা হয়।

নিয়মিত খরচ (প্রতিবছর) ঃ ফল সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যয় নিম্নে দেওয়া হল —

ফল তোলা ও সংগ্রহ খরচ (১০০টি জন)	২৭০০০/-
পরিবহন খরচ	৫০০০/-
মোট খরচ	৩২,০০০/-

দশম বছর মোট খরচ = (১,১৯০০০ + ৩২,০০০)/-

= ১,৫১,০০০/-

দশম বছর লাভ = ৩,৮৪,০০০ – ১,৫১,০০০ = ২,৩৩,০০০/-

একাদশতম ও তৎ পরবর্তী বছরগুলিতে লাভ

= (৩,৮৪,০০০–৩২,০০০)/-

= ৩,৫২,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩২ : ৩৫২ = ১ : ১১

ব্যবহার ঃ

মূল ঃ জ্বর, পেট ব্যথা, বুক ধরফড় করা, প্রস্রাবের সমস্যা, মেলানকোলিয়া সহ নানাবিধ মানসিক রোগে এর ব্যবহার দেখা যায়।

মূলের ছাল ঃ সাপ কামড়ালে জল দিয়ে বেটে খাওয়ানো হয়।

টাটকা পাতা ঃ চোখ ওঠা, বধিরতা ও নানা প্রকার প্রদাহে ব্যবহৃত হয়।

ফুল ঃ আমাশয়ে এর ব্যবহার দেখা যায়।

কাঁচা ফল ঃ অর্শ, আমাশয় ও উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

পাকা ফল ঃ দৈহিক দুর্বলতায় ও কোষ্ঠকাঠিন্যে সুফলদায়ী, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্ক সবল রাখে।

কালমেঘ

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Andrographis paniculata*

ফ্যামিলি ঃ Acanthaceae

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত উষ্ণতর অঞ্চল

বর্ণনা ঃ সোজাভাবে বেড়ে ওঠা এক ধরণের কর্মজীবী দ্বিবীজপত্রী তিক্ত বীরুৎ-জাতীয় উদ্ভিদ। কান্ড প্রচুর শাখা-প্রশাখাযুক্ত, মসৃণ, চারকোনা পাতা ভল্লাকার মসৃণ। ফুলগুলি কাক্ষিক বা শীর্ষদেশে অবস্থিত অনুভূমিক ভাবে ছড়ানো নিয়ত পুষ্পমঞ্জরিতে বিন্যস্ত থাকে। দলমন্ডল গ্রন্থিযুক্ত, রোমশ, সাদার মধ্যে বেগুনি আভাযুক্ত। পুংকেশর ২টি, দন্ডের উপরিভাগ ঘন রোঁয়ায় ঢাকা থাকে। ফলগুলি ক্যাপসিউল. শীর্ষ ও নিম্নভাগ তীক্ষ্ণ। বীজগুলি বাদামী রঙের, প্রায় চারকোণা, খাঁজযুক্ত।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ আগষ্ট - মার্চ

বাস্তুসংস্থান ঃ বুনো, সাধারণভাবে সচরাচর দেখা যায়।

বংশবিস্তার ঃ বীজের মাধ্যমে

চাষ - আবাদ ঃ জল নির্গমনের ব্যবস্থা আছে এমন বেলে - দোঁআশ মাটিতে জৈবসার প্রয়োগ করে চাষ করলে গাছের ভালো বৃদ্ধি হয়। তবে যে কোন জায়গায় যে কোন প্রকার জমিতে চাষ করা যেতে পারে। জমিতে সরাসরি বীজ ছড়িয়ে কিংবা বীজতলায় চারাগাছ জন্মিয়ে পরে তা জমিতে রোপণ করে চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। জুন - জুলাই মাস গাছ রোপণের প্রকৃষ্ট সময়। আগাছা পরিস্কার করে জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

কিছু কিছু শুঁটি পেকে গেছে এমন অবস্থায় কালমেঘের কান্ড বা ডালপালা কেটে নিয়ে পাতলা কালমেঘের পাকা শুঁটির উপর পাতলা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের শুঁটিগুলি শব্দ করে ফাটতে থাকে। ঢাকা না দিলে বেশীর ভাগ বীজ বাইরে চলে যাবে। এইভাবে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর ফেটে যাওয়া শুঁটি ও ডালপালা সরিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিশিন্দা বা বেগনা পাতার গুঁড়ো সহ পরিষ্কার শুকনো কাচের বা প্লাস্টিকের জারে রেখে প্রায় এক বছর পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। মে - জুন মাসে নার্সারিতে চারা তৈরির জন্য একভাগ ভাল মাটি, এক ভাগ বালি, একভাগ গোবর সার এবং কিছু পরিমাণ মিথাইল প্যারাথিয়ন ২ শতাংশ পাউডার মিশিয়ে বীজতলা তৈরী করা যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে বীজতলায় যেন জল না জমে। এরপর পাতলা করে বীজ ছড়িয়ে মাটি দিয়ে হালকা করে বীজ ঢেকে খড় চাপা দিয়ে দিতে হবে এবং নিয়ম করে জল দিতে হবে। ৮ - ১০ দিন পরেই বীজের অঙ্কুর বেরোতে শুরু করে এবং ৪৫ থেকে ৫০ দিন পরে জমিতে লাগানোর উপযুক্ত চারা তৈরী হয়ে যায়। বীজের অঙ্কুর হতে দেখা গেলে সাবধানে বীজতলা থেকে খড় তুলে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে চারা তৈরির খরচ পড়ে হাজার প্রতি আনুমানিক ১৫০০ টাকা। তবে নার্সারিতে ১০ সেমি. × ১৫ সেমি. পলিপটে চারা তৈরির খরচ পড়ে হাজার প্রতি ৩৫০০ টাকা।

বেশি পরিমাণে কালমেঘ চাষ ঃ হেক্টর প্রতি ২৫ টন গোবর সার ছড়িয়ে বার বার লাঙ্গল চালিয়ে, শেষে মই দিয়ে জমি তৈরি করে নেওয়া উচিৎ। জমিটিকে কয়েকটি খোপে ভাগ করে নিলে নিজেদের চলাফেরা ও সেচ দিতে সুবিধা হবে।

জুন মাসে এক - দুবার বৃষ্টির পর তৈরি জমিতে ৩০ সেমি. ব্যবধানে লাঙ্গল দিয়ে লম্বা খাত (furrow) করে নিয়ে ১৫

হলুদ

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Curcuma longa*

ফ্যামিলি ঃ Zingiberaceae

বিস্তৃতি ঃ দক্ষিণবঙ্গে চাষ করা হয়।

বর্ণনা ঃ একটি সুগন্ধযুক্ত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। বড় আকারের বেলনাকৃতি উজ্জ্বল কমলা রঙের রাইজোম বা মৌলকান্ড থাকে। পাতাগুলি বড় ও গুচ্ছে অবস্থিত, মসৃণ, সবৃন্তক, ফুল সোনালী, হলুদ বা সবুজের আভাযুক্ত হলুদ রঙের, নীচের দিকে মঞ্জরিপত্রযুক্ত অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরিতে বিন্যস্ত থাকে। দলমন্ডলের

উপরের দিকের চূড়া ফণার মতো, ফাঁক থাকে, অল্প রোমযুক্ত ওষ্ঠ উলটানো ডিম্বাকার বা প্রায় গোলাকার। পাশের নিস্ক্রিয় পুংকেশর বড়, আয়তাকার। সক্রিয় পুংকেশর ১টি পরাগধানী নীচের দিকে কিছুটা বক্র, গর্ভাশয়ের উপরের দিকে রোম থাকে।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ জুলাই - ডিসেম্বর

বাস্তসংস্থান ঃ চাষ করা হয়।

বংশবিস্তার ঃ রাইজোমের সাহায্যে

চাষ-আবাদ ঃ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মাটিতে জন্মায়। তবে জমিতে উত্তম জলনিকাশী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। রাইজোম পরিণত গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। হাত কোদাল দিয়ে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে ২৫ সেমি. × ৩০ সেমি. ব্যবধানে রাইজোমগুলি লাগানো হয়। রাইজোম লাগানোর পর

ভেষজ চারা (হরিতকি, বহেড়া, অর্জুন, আমলকি, অশোক) বাগানের মধ্যেও আন্তঃফসল রূপে কালমেঘ চাষ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা দুইভাবেই লাভবান হব।

চারাবাগান তৈরীর আগের জমিতে ভাল করে লাঙ্গল চালিয়ে জমি তৈরী করে নিতে হবে। চারাগাছ লাগানোর মত ২.৫ মিটার × ২.৫ মিটার ব্যবধান ছেড়ে এবং গাছের গোড়া থেকে

৬০ সেমি. জায়গা ছেড়ে দুই লাইন চারাগাছের মধ্যে ১.৩০ মিটার আমরা কালমেঘের বীজ জুন - জুলাই মাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি। বীজ ছড়ানোর পর মাটি দিয়ে হালকা করে বীজ ঢেকে দিতে হবে। এরপর ৮-১০ দিন পরই বীজের অঙ্কুর বেরোতে শুরু করে। কালমেঘ চাষে বিশেষ কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এরপর চারা বাগানে 1st Mulching, 2nd Mulching করার সময় আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে অতি কম খরচে আমরা কালমেঘ চাষ করতে পারি।

ফলন ঃ চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর থেকেই গাছের উপরিভাগের ডাল-পালা ও পাতা কেটে নেওয়া যেতে পারে। ৬ মাস পরে পুরো গাছই তুলে নিয়ে শুকিয়ে ফলন পাওয়া সম্ভব। এভাবে বছরে দুই-তিনবার একই জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। এক হেক্টর জমি থেকে প্রায় ৩০০০ কেজি. কালমেঘ পাওয়া যাবে। যদি আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা হয় তবে ২৫০০ কেজি. পাওয়া যাবে। ডালপালা ও পাতা সহ কালমেঘের বাজার মূল্য সর্বনিম্ন ৩০ টাকা প্রতি কেজি।

কালমেঘ চাষের (একক ফসল ও আন্তঃফসল) সর্ব্বোচ্চ খরচ ও সর্বনিম্ন লাভের হিসেব ও অনুপাত (প্রতি হেক্টর)

বিষয়	খরচ
বীজ ক্রয় বা সংগ্রহ খরচ	৫,০০০/-
জমির কর্ষণ খরচ	১০,০০০/-
বীজ বপন খরচ (৫টি জন)	১,৩২০/-
জমির আগাছা পরিষ্কার (২০ টি জন)	৫,৪২০/-
ফসল তোলা বা সংগ্রহ খরচ (৩০টি জন)	৮,১৩০/-
ফসল শুকনো করার খরচ (৩০টি জন)	৮,১৩০/-
পলিথিন বাবদ খরচ	৬,০০০/-
মোট খরচ	**৪৪,০০০/-**

(ডালপালা ও পাতা সহ শুকনো কালমেঘ-এর সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য (বাজার মূল্য) প্রতি কেজি ৩০ টাকা।) একক ফসলে ৩০০০ কেজি পর্যন্ত শুকনো কালমেঘ এক হেক্টর জমি থেকে পাওয়া যায়। একক ফসলে বিক্রয়মূল্য ৯০,০০০ টাকা।

সর্বনিম্ন লাভ (একক ফসল) ঃ (৯০,০০০ – ৪৪,০০০)/- = ৪৬,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত ঃ ৪৪:৪৬=১:১

যখন আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করা তখন সর্বোচ্চ খরচ ৩২,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল হিসাবে সর্বনিম্ন ২৫০০ কেজি ফলন পাওয়া যাবে যার বিক্রিয় মূল্য প্রতি কেজি ৩০টাকা।

২৫০০ কেজি. ফলনের বিক্রয়মূল্য (প্রতি কেজি. ৩০ টাকা দর) = (২৫০০ × ৩০) = ৭৫,০০০ টাকা।

সেক্ষেত্রে লাভ = ৭৫,০০০ – ৩২,০০০ = ৪৩,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩২০০০ : ৪৩০০০ = ১ : ১.৩

ব্যবহার ঃ সমগ্র উদ্ভিদ - জ্বর, সাধারণ দূর্বলতায়, আমাশয়, হজমের গন্ডগোল

ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। ভেজানো জল বা নির্যাস সকালে খালি পেটে খেলে চুলকানি, কুষ্ঠ, হুপিং কাশি নিরাময় হয়। লিভারের সমস্যায় এটি কার্যকরী।

পাতা ঃ পেটব্যথা, খিদে না হওয়া, অনিয়মিত মলত্যাগ ইত্যাদি সমস্যায় ব্যবহৃত হয়। পাতা বেটে নিয়ে তা বড়ির আকারে বানানো হয়, এই বড়ি বা ট্যাবলেট নিয়মত খালিপেটে খেলে হজমের সমস্যা মিটে যায়, লিভারও সক্রিয় থাকে।

মূল ঃ শিশুদের সাধারণ দূর্বলতায় বিশেষভাবে কার্যকরী।

মাটি ও গোবর সার মিশিয়ে হালকা করে লাগানো রাইজোমের ওপর চাকা দেওয়া হয়। ১ হেক্টর হলুদ চাষের জন্য ২৫০০ কেজি হলুদ রাইজোমের প্রয়োজন। নিয়মিত নিয়মমাফিক গাছের পরিচর্যা একান্ত দরকার।

রাইজোম লাগানোর সময় মে - আগষ্ট। যেমন - ভুট্টা, বেগুন, টম্যাটো ইত্যাদি অন্যান্য ফসলের সঙ্গে আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করা হয় এবং জঙ্গলে চারাবাগানের মধ্যেও ইন্টারক্রপিং করে হলুদ চাষ করা যেতে পারে। হলুদ চাষে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে হলুদ রাইজোমগুলি আমরা ব্যবহার করবো সেগুলি যেন জীবাণুমুক্ত ভাল মানের রাইজোম হয়।

আমরা রাইজোম লাগানোর ক্ষেত্রে মা-রাইজোম বা তা থেকে বের হওয়া ছোট ছোট আঙ্গুলের মত রাইজোমগুলি ৪-৫ সেমি লম্বা করে ২-৩ টি টুকরো করে লাগাতে হবে। তবে দেখতে হবে প্রতি টুকরোতে যেন কমপক্ষে একটি মুকুল থাকে। অনেক সময় হলুদের রাইজোমগুলি খড় ভিজিয়ে ঢেকে রাখা হয় যাতে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের হয়।

হলুদ চাষে জৈব সার বা গোবর, হাড় গুঁড়ো ৫-৭ টন প্রতি হেক্টরে ব্যবহার করা হয়। বড় রকমের রোগ পোকার আক্রমণ হলুদ গাছে দেখা যায় না।

ফসল তোলা ও প্রক্রিয়াকরণ ঃ সাধারণতঃ জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ-এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত পরিণত হলুদ জমি থেকে তোলা হয়। যখন মাটির নীচে হলুদ পরিণত হয়ে যায় তখন মাটির উপর থাকা পাতা ও কান্ড অংশটি ক্রমশ হলুদ বর্ণের হয়ে শুকিয়ে যায়। পরিণত হলুদ মাটি খুঁড়ে তোলার পর মা রাইজোম

আন্তঃফসল হিসেবে সর্বনিম্ন ফলন ২০ কুইন্ট্যাল, যার সর্বনিম্ন বাজার মূল্য ৬,০০০/- প্রতি কুইন্ট্যাল

বিক্রয়মূল্য = (২০ × ৬০০০) /- =১,২০,০০০/-

সর্বনিম্ন লাভ (হেক্টর প্রতি) = (১,২০,০০০ – ৪৭,০০০)/- = ৭৩,০০০/-

খরচ ও লাভের আনুপাতিক ভাগহার = ৪৭ : ৭৩ = ১ : ১.৫

ব্যবহার ঃ রক্ত সংক্রান্ত রোগ, শ্বেতী, খোস - পাঁচড়া, মুত্রের সঙ্গে স্রাব নির্গত হওয়া, প্রদাহ, পিত্তজনিত সমস্যা অজীর্ণ, গোদ দুটিবসন্ত, ফোলা, ফোঁড়া, নাক দিয়ে জল পড়া, রোগ, উদরাময়, সবিরাম জ্বর, শোথ, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশুর বসন্তরোগের প্রতিষেধক রূপে চিটেগুড়ের সঙ্গে হলুদ গুঁড়ো খাওয়ানো হয়, চর্মরোগেও সরষের তেলের সঙ্গে গুঁড়ো হলুদ মিশিয়ে লাগানো হয়।

পাতা ঃ পাতার রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে দুবার খেলে আমাশয় রোগ সারে।

এবং তা থেকে বের হওয়া আঙ্গুলের মত রাইজোমগুলি আলাদা করে নেওয়া হয়। এরপর রাইজোমগুলি ভাল করে পরিষ্কার করে তামা, লোহা বা মাটির পাত্রে পরিষ্কার জলে গরম করে নেওয়া হয় যাতে ঐ রাইজোমগুলির অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং হলুদের রং ঠিক থাকে। গরম করা হলুদ গুলো সূর্যের আলোয় গরম করা হয়। সাধারণত ৪৫ - ৬০ মিনিটে রাইজোমগুলিকে গরম করা হয় অল্প আঁচে। গরম করার পর রাইজোমগুলি নরম হয়ে যায় এবং জলের উপর যখন সাদা ফেণা ভাসতে থাকে তখন বোঝা যায় গরম করা সম্পূর্ণ হয়েছে।

জমি থেকে হলুদ তোলার ২ - ৩ দিন পর হলুদ গরম করা হয়। মা রাইজোম এবং তা থেকে বের হওয়া রাইজোম আলাদা করে গরম করা হয়। গরম করা হলুদ বাঁশের মাদুরের উপর বিছিয়ে সূর্যের আলোয় ১০ - ১৫ দিন শুকনো করা হয়।

এইভাবে চাষ করলে ১ হেক্টর জমি থেকে ১৬০০০ কেজি থেকে ১৮০০০ কেজি হলুদ পাওয়া যায়।

ফলন ঃ সাধারণতঃ জানুয়ারী - মার্চ মাস নাগাদ পরিণত হলুদ মাঠ থেকে তোলা হয়। কাঁচা হলুদ তোলার পর বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেগুলো গরম করা হয় ব্যবহার উপযোগী করার জন্য। এক হেক্টর জমি থেকে কমপক্ষে ৩০ কুইঃ কাঁচা হলুদ পাওয়া যেতে পারে, যার বাজার মূল্য ৬০০০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল।

হলুদ চাষের খরচ ও তা থেকে লাভ (প্রতি হেক্টর)

একক ফসল হিসেবে চাষের খরচ

বিষয়	খরচ
জমি তৈরীর খরচ	১২,০০০/-
বীজ ও সার বাবদ খরচ	২৫,০০০/-
বীজ বপন ও আগাছা পরিস্কার	১৫,০০০/-
ফসল তোলা বাবদ খরচ (৮০টি জন)	২১,৬০০/-
গরম করার খরচ	৬,৪০০/-
শুকনো করার খরচ	৬,০০০/-
পরিবহন খরচ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	৯০,০০০/-

একক ফসল হিসাবে চাষ করলে সর্বনিম্ন ফলন ৩০ কুইন্ট্যাল, যার সর্বনিম্ন বাজার মূল্য ৬,০০০/- প্রতি কুইন্ট্যাল

বিক্রয়মূল্য = (৩০ × ৬০০০) /- =১,৮০,০০০/-

সর্বনিম্ন লাভ (হেক্টর প্রতি) = (১,৮০,০০০ – ৯০,০০০)/- = ৯০,০০০/-

খরচ ও লাভের আনুপাতিক ভাগহার = ৯০ : ৯০ = ১ : ১

হলুদ চাষের খরচ ও তা থেকে লাভ (প্রতি হেক্টর)

আন্তঃফসল হিসেবে চাষের খরচ

বিষয়	খরচ
আন্তঃফসল হিসেবে চাষের মোট খরচ	৩০,৬০০/-
গরম করার খরচ	৬,৪০০/-
শুকনো করার খরচ	৬,০০০/-
পরিবহন খরচ	৪,০০০/-
সর্ব্বোচ্চ মোট খরচ	**৪৭,০০০/-**

ঘৃতকুমারী (অ্যালোভেরা)

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Aloe barbadensis*

ফ্যামিলি ঃ Liliaceae

বর্ণনা ঃ এক ধরণের কান্ডহীন রসাল বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ভূনিম্নস্থ কান্ড থেকে চারা গাছ জন্মায়। পাতাগুলি খুব পুরু, গোলাপের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, হালকা সবুজ, অগ্রভাগ লম্বা, ক্রমশঃ সুঁচালো, মসৃণ, কিনারা করাতের মত দাঁতযুক্ত। মঞ্জরিপত্র লম্বা, সরল ও শাখাযুক্ত। ফুলগুলি অনিয়ত মঞ্জরিতে বিন্যস্ত, পুষ্পপুট নলাকার, ফিকে লাল, পুংকেশর পুষ্পপুটের চূড়ার সংখ্যার সমান। গর্ভদন্ড সুতোর মত। বীজ খুব কম দেখা যায়।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ গাছের বয়স অনুসারে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

বাস্তুসংস্থান ঃ চাষ করা হয়। খুব কমই বুনো অবস্থায় চোখে পড়ে।

বংশবিস্তার ঃ চোষক মূল ও বুলবিল বা কাক্ষিক মুকুল

চাষ - আবাদ ঃ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বেলে বা দোআঁশ মাটিতে জন্মায়, উত্তম জলনিকাশি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। চোষকমূল ও বুলবিল পরিণত গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। শুষ্ক অঞ্চলে ভালো জলসেচ ব্যবস্থা দরকার। পশ্চিম বাংলায় অনুকূল জল - হাওয়া থাকায় ঘৃতকুমারীর ব্যাপক চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

চারা তৈরি ঃ এক বছরের পুরোনো ঘৃতকুমারী গাছের চারপাশে ছোট ছোট চারা বের হতে দেখা যায়। আগাছা পরিষ্কার করে মাটি আলগা করে দিলে বছরে এক একটি ঘৃতকুমারী গাছ থেকে ২০ - ২৫ টি ছোট চারা সহজেই

অ্যালোভেরা চাষের (আন্তঃফসল)

সর্বোচ্চ খরচ ও সর্বনিম্ন লাভের হিসেব ও অনুপাত (প্রতি হেক্টর)

বিষয়	খরচ
গাছের চারা বাবদ খরচ (৩৫,০০০ চারা)	৪৫,০০০/-
চারা লাগানোর খরচ ও জমি তৈরির খরচ (২৫টি জন)	৬,৭৫০/-
ফসল কাটার সর্বোচ্চ খরচ (২৫টি জন)	৬,৭৫০/-
প্যাকিং / লোডিং ইত্যাদি বাবদ খরচ	১০,০০০/-
পরিবহন বাবদ খরচ	১০,২৫০/-
মোট খরচ (যখন আন্তঃফসল হিসেবে চাষ)	**৭৮,৭৫০/-**

দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় বছরে গড়ে সর্বনিম্ন ফলন ২৫ টন / হেক্টর যার বাজার মূল্য ১৫০০০ টাকা প্রতি টন।

সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য = ৩,৭৫,০০০/-

সর্বনিম্ন লাভ (হেক্টর প্রতি) = (৩,৭৫,০০০ – ৭৮,৭৫০)/-

= ২,৯৬,২৫০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ১ : ৩ .৮৪ (প্রায়)

ব্যবহার ঃ

রসালো অংশ – কোষ্ঠবদ্ধতা, বদহজম, মহিলাদের ঋতুর সমস্যায়, অর্শ, পেটে টিউমার, একজিমা, উদরাময় ও আমাশয় ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

পাতা – শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতায় পাতার রস রেড়ির তেলের সঙ্গে মিশিয়ে পেটে মালিশ করা হয়। পাতার রস গর্ভপাত ত্বরান্বিত করে। মাথা খারাপ হলে পাতার রস মাথায় দিলে ঘুম হয়।

পাওয়া যায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় জল না জমে। খুব ছোট চারা পুরোনো গাছের পাশ থেকে তুলে নিয়ে নার্সারিতে অন্যত্র নিয়মিত পরিচর্যায় রেখে বড় করে জমিতে লাগাতে হবে। এজন্য পুরোনো ও নতুন চারার পরিচর্যা বাবদ খরচ পড়ে হাজার প্রতি ২৫০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা।

বেশী পরিমাণে চাষ ঃ হেক্টর প্রতি ২৫ টন গোবর সার ছড়িয়ে ২ বার হাল চালিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করে নিতে হবে। জমিতে যাতে জল না জমে তার জন্য চারপাশে নালা করে নিতে হবে। জুনের শেষ বা জুলাই মাসে প্রথম বর্ষার সময় ২০ থেকে ২৫ সেমি লম্বা ছোট চারা নিয়ে, তৈরি জমিতে ৬০ সেমি. ব্যবধানে লাইন ফেলে, ৭৫ সেমি. বা ৬০ সেমি. দূরত্বে লাগিয়ে দিন। খেয়াল রাখতে হবে চারাগুলির উচ্চতার ৩ ভাগের ২ ভাগ যেন মাটিতে পোঁতা থাকে। বৃষ্টি না হলে চারা লাগানোর পর একবার সেচ দেওয়া জরুরী। এরপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। বছরে মোটামুটি ৫ - ৬ বার সেচ দিলেই চলে।

চারা লাগানোর ১৫ থেকে ২০ দিন পর হেক্টর প্রতি প্রয়োজন মতো নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার চারার গোড়ায় চারপাশে গোল করে দিলে ফলন ভাল হয়। জমি আগাছামুক্ত থাকা জরুরী। বছরে কমপক্ষে ২ - ৩ বার আগাছা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল।

ফলন ঃ চারা লাগানোর ৮ - ৯ মাস পর অথবা ১ বছর পর ফসল কাটা হয়। এই সময় লম্বা রসালো গাছটি এমনভাবে মাটির নীচেই

থেকে যায়, এই রাইজোমগুলি থেকে পরের বছর চারা পাওয়া যায়। বিভিন্ন বইতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান জানাচ্ছে যে, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম বছর পর্যন্ত বছরে গড়ে কমপক্ষে ৪০ - ৫০ টন কাঁচা ঘৃতকুমারী পাওয়া যেতে পারে। প্ল্যাণ্টেশনে গাছের চারার লাইনের মাঝের জায়গায় গাছের চারার দিকে ৬০ সেমি. করে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। এরপর বাকী জায়গায় ৬০ সেমি ব্যবধানে লাইন ফেলে প্রতি লাইনে ৬০ সেমি তফাতে ঘৃতকুমারী লাগানো যেতে পারে।

অ্যালোভেরা চাষের (একক ফসল)

সর্বোচ্চ খরচ ও সর্বনিম্ন লাভের হিসেব ও অনুপাত (প্রতি হেক্টর)

বিষয়	**খরচ**
গাছের চারা বাবদ খরচ (৭০,০০০ চারা)	৯০,০০০/-
চারা লাগানোর খরচ ও জমি তৈরির খরচ (১০৫টি জন)	২৮,৩৫০/-
ফসল কাটার সর্বোচ্চ খরচ (৫০টি জন)	১৩,৫৫০/-
প্যাকিং / লোডিং ইত্যাদি বাবদ খরচ	১৩,০০০/-
পরিবহন বাবদ খরচ	১০,১০০/-
মোট খরচ (যখন একক ফসল হিসেবে চাষ)	**১,৫৫,০০০/-**

দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় বছরে গড়ে সর্বনিম্ন ফলন ৩৫ টন / হেক্টর যার বাজার মূল্য ১৫০০০ টাকা প্রতি টন।

সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য = ৫,২৫,০০০/-

সর্বনিম্ন লাভ (হেক্টর প্রতি) = (৫,২৫,০০০ – ১,৫৫,০০০)/-

= ৩,৭০,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ১৫৫ : ৩৭০ = ১ : ২.৪ (প্রায়)

তুলসী / রাধাতুলসী

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Ocimum sanctum*

ফ্যামিলি ঃ Labiatae, Lamiaceae

বিস্তৃতি ঃ সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ

বর্ণনা ঃ এটি শাখাবহুল ও বর্ষজীবী ঝোপজাতীয় উদ্ভিদ। কান্ড প্রায় চারকোণা, নরম ও ছড়ানো রোম দিয়ে ঢাকা থাকে। পাতাগুলি উপবৃত্তাকার, আয়তাকার, অগ্রভাগ মূল স্থুল বা সুক্ষ্ম, কিনারা খাঁজহীন বা দাঁতযুক্ত, দুই পিঠই রোমযুক্ত, নীচের দিক সরু অথবা গোলাকার। ফুলগুলি অনিয়ত মঞ্জরীতে ঘনভাবে আবর্তে বিন্যস্ত থাকে, মঞ্জরিপত্র ডিম্বাকার ও রোমশ, দলমন্ডল লালের আভাযুক্ত হালকা বেগুনি রঙের। ফলগুলি উপবৃত্তাকার, প্রায় মসৃণ, হলদে, কালো দাগ থাকে।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ সারা বছর

বাস্তুসংস্থান ঃ বনে জঙ্গলে জন্মায় আবার চাষ করাও হয়।

বংশবিস্তার – বীজের সাহায্যে

চাষ - আবাদ – নানা প্রকার জলবায়ুতে নানা ধরণের মাটিতে বেড়ে ওঠে।

চারা তৈরি করার পদ্ধতি ঃ মোটামুটি সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে তুলসী গাছে প্রায় সারা বছরই ফুল ও ফল হয়। গোটা পুষ্পদন্ডটি শুকিয়ে গেলে তা কেটে নিন। এর পর পুষ্পদন্ডের গোড়ায় ধরে ডগা পর্য্যন্ত টান দিয়ে শুকনো ফলগুলি সাবধানে সংগ্রহ করে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিন। এরপর শুকনো ফলগুলি প্লাস্টিকের চাদরে বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপরে দু-হাতের তালু দিয়ে ঘষে গুঁড়ো করে কুলো দিয়ে ঝেড়ে, ফলের খোসা ছাড়িয়ে

মাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি। বীজ ছড়ানোর পর মাটি দিয়ে হালকা করে বীজ ঢেকে দিতে হবে। এরপর ৮ - ১০ দিন পরই বীজের অঙ্কুর বেরোতে শুরু করে। এরপর চারা বাগানে 1st mulching, 2nd mulching করার সময় আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে অতি কম খরচে আমরা তুলসী চাষ করতে পারি।

ফলন ঃ চারা লাগানোর তিন - সাড়ে তিন মাস পরেই কান্ড সহ ডালপালা কেটে নেওয়া যেতে পারে। তবে মাটি থেকে কমপক্ষে ১৫ সেমি. কান্ড রেখে বাকি অংশ কাটা উচিত। প্রথমবার কাটার দুই - আড়াই মাস পর পুনরায় ফসল কাটা যেতে পারে। এইভাবে এক হেক্টর জমি থেকে বছরে ৫ টন পর্য্যন্ত কচি ডালপাতা সহ ফসল পাওয়া যেতে পারে। যার বাজার মূল্য ১৫.০০/ কেজি।

তুলসী চাষের খরচ (একক ফসল)

সর্বোচ্চ খরচ ও সর্বনিম্ন লাভের হিসেব ও অনুপাত (প্রতি হেক্টর)

বিষয়	খরচ
গাছের চারা বাবদ খরচ	৬,৬০০/-
বাগান তৈরি করার খরচ (প্রতি হেক্টর)	২৪,৪০০/-
মোট খরচ (যখন একক ফসল হিসেবে চাষ)	**৩১,০০০/-**

হেক্টর প্রতি ৭ টন কচি ডালপালা সহ কাঁচা পাতা পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য ১৫ টা প্রতি কেজি

সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য = ১০৫,০০০/-

সর্বনিম্ন লাভ (হেক্টর প্রতি) = (১০৫,০০০ – ৩১,০০০)/-

= ৭৪,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ৩১:৭৪ = ১:২.৪ (প্রায়)

মিহি চালুনীর সাহায্যে সুক্ষ্ম বীজগুলি আলাদা করে নিন, পরিষ্কার বীজ এরপর ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে শুকনো নিশিন্দা পাতা সহ কাচের বা প্লাস্টিকের জারে এক বছর পর্য্যন্ত রেখে দিতে পারেন।

সম্ভব হলে মাঠেই নার্সারি করে নেওয়া ভালো। একভাগ ভালো মাটি, একভাগ গোবর সার, একভাগ বালি ও কিছু পরিমাণ মিথাইল প্যারাথিন ২ শতাংশ পাউডার মিশিয়ে বীজতলা করে পাতলাভাবে বীজ বোনা হয়। গোবর সারের গুঁড়ো দিয়ে বীজ ঢেকে পাতলা করে খড় চাপা দিতে হবে। নিয়মিত জল দিয়ে গেলে বীজ বোনার ৮ - ১০ দিন পরেই বীজের অঙ্কুর দেখা যায়। বীজের অঙ্কুর দেখা গেলে সাবধানে খড় তুলে নিতে হবে। এরপর ৫০ - ৬০ দিন পরেই জমিতে লাগানোর উপযুক্ত চারা হয়ে যায়। বীজতলায় নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিৎ। চারা লাগাবার ১০ - ১৫ দিন আগে লিটার প্রতি জলে ২ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে বীজতলায় চারার উপর স্প্রে করে দিলে চারা খুব ভাল বাড়ে।

বীজতলায় জমিতে চারা তৈরির খরচ পরে হাজার প্রতি ১২০০ - ১৫০০ টাকা। নার্সারিতে ১০ সেমি. × ১৫ সেমি. পলিপটে চারা তৈরির খরচ পড়ে ২০০০ - ২৫০০ টাকা।

বেশী পরিমাণে কৃষ্ণতুলসীর চাষ ঃ হেক্টর প্রতি ১৫ টন গোবর সার ছড়িয়ে বার বার হাল চালিয়ে জমি তৈরি করে নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। নিজেদের চলাফেরা ও সেচের সুবিধার জন্য জমিটিকে কয়েকটি ছোট ছোট খোপে ভাগ করে নেওয়া ভাল। জুনের শেষ বা জুলাই-এর প্রথমে বর্ষার সময়

বীজতলা থেকে চারা এনে তৈরি জমিতে ৪৫ সেমি ব্যবধানে লাইন ফেলে ৩০ বা ৪৫ সেমি. তফাতে লাগাতে হবে। চারা লাগাবার পর বৃষ্টি না হলে একবার সেচ দিতে হবে। ছোট চারা উইপোকায় নষ্ট হয়। তাই চারা লাগাবার সময় কীটনাশক ব্যবহার করা জরুরী। চারা লাগাবার একমাস পর প্রয়োজন বুঝে ১ - ২ বার আগাছা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। এছাড়া চারা লাগাবার ২ মাস পর ২ লাইনের মাঝের জায়গাতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিলে ফলন ভালো হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বার ফসল তোলার পর মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফেট সার দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জমিতে সেচ দিতে হবে অবস্থা বুঝে। গরমের সময় প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ বার সেচ দরকার। তুলসীর ছোট চারায় উইপোকার আক্রমণ ছাড়া আর কোন ক্ষতিকারক রোগ বা পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ দেখা যায়নি।

চারা লাগানোর তিন থেকে সাড়ে তিন মাস পর গাছের কান্ড মাটি থেকে ১৫ - ২০ সেমি. রেখে উপরের বাকী অংশ কেটে নিন। কাটা অংশ ছায়ায় শুকোতে দেওয়া হয়। ফসল কাটতে হবে ভাল রোদের দিনে। কাটা ফসলে জল বা শিশির না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। এতে স্বাভাবিক রং নষ্ট হবে না। প্রথম ফসল তোলার দুই থেকে আড়াই মাস পরে পুনরায় ফসল কাটা যেতে পারে। প্রায় ১ হেক্টর জমিতে গড়ে বছরে ৫ টন কচি ডালপালা সহ কাঁচা পাতা পাওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে থাকা শাল জঙ্গল / ভেষজ গাছের বাগানের মধ্যে আন্তঃফসলরূপে তুলসী চাষ ঃ দক্ষিণবঙ্গে বিদ্যমান শাল জঙ্গলগুলিতে বা নতুন করে ভেষজ চারা (হরিতকি, বহেড়া, অর্জুন, আমলকি, বেল) বাগানের মধ্যেও আন্তঃফসল রূপে তুলসী চাষ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা দুইভাবেই লাভবান হব।

চারাবাগান তৈরীর আগে জমিতে ভাল করে লাঙ্গল চালিয়ে জমি তৈরী করে নিতে হবে। চারাগাছ লাগানোর মত ২.৫০ মিটার × ২.৫০ মিটার ব্যবধান ছেড়ে এবং গাছের গোড়া থেকে ৩০ সেমি. জায়গা ছেড়ে দুই লাইন চারাগাছের মধ্যে ১.৩০ মিটার জায়গায় আমরা তুলসী বীজ জুন - জুলাই

শিকড় পাওয়া যায়। যার বাজার মূল্য ৬৫.০০ / কেজি। বাজারে প্রতি বছর ৩০০ টন অনন্তমূলের চাহিদা আছে।

অনন্তমূল চাষের খরচ (আন্তঃফসল)

সর্বোচ্চ খরচ ও সর্বনিম্ন লাভের হিসেব ও অনুপাত (প্রতি হেক্টর)

বিষয়	খরচ
বীজ বপন বাবদ খরচ	৪,৫০০/-
চারা বাগানে বা ঔষধি বৃক্ষের বাগানে আন্তঃফসল হিসাবে চাষের খরচ (৪০টি জন)	১০,৮০০/-
ফসল তোলা ও শুকনোর খরচ	৫,০০০/-
পরিবহন খরচ	৪,৭০০/-
মোট খরচ (যখন আন্তঃফসল হিসেবে চাষ)	**২৫,০০০/-**

দেড় থেকে দুই বছর পর হেক্টর প্রতি ফলন (সর্বনিম্ন) ১.২৫ টন (শুকনো মূল)। যার বাজার মূল্য ৬৫/- প্রতি কেজি (শুকনো মূল)।

সর্বনিম্ন মোট আয় – (১২৫০ x ৬৫) টাকা = ৮১,২৫০/-

হেক্টর প্রতি সর্বনিম্ন লাভ – (৮১,২৫০ – ২৫,০০০) = ৫৬,২৫০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ২৫,০০০:৫৬,২৫০ = ১ : ২.২৫ (প্রায়)

ব্যবহার ঃ মূল - শরীরের গঠনগত দুর্বলতা ও কিডনির সমস্যায় এটি একটি মূল্যবাণ ভেষজ। ক্ষুধাহীনতা, ডায়েরিয়া, অর্জীন, জ্বর, শ্বেতপ্রদাহ, দীর্ঘকালীন বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, সিফিলিস, দীর্ঘকালীন কাশি, অর্শ আলসার, কিডনিতে পাথর জমা ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাবের রং গাঢ় ও খুব কম প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি সমস্যায় গরুর দুধের সঙ্গে শুকনো মূলের গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে উপকার হয়। এছাড়া স্তন দুগ্ধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য, আহারে রুচি আনার জন্য ও শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে এটি ব্যবহৃত হয়। গোদ, দেহের একপাশ অসাড় হয়ে যাওয়া, বমি ও গা গুলিয়ে ওঠা ইত্যাদি নানা সমস্যায় এর ব্যবহার দেখা যায়।

তুলসী চাষের খরচ (আন্তঃফসল)

সর্বোচ্চ খরচ ও সর্বনিম্ন লাভের হিসেব ও অনুপাত (প্রতি হেক্টর)

বিষয়	খরচ
গাছের চারা ও বাগান তৈরি করার খরচ	২৫,০০০/-
মোট খরচ (যখন আন্তঃফসল হিসেবে চাষ)	**২৫,০০০/-**

হেক্টর প্রতি সর্বনিম্ন ৪ টন কচি ডালপালা সহ কাঁচা পাতা পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য ১৫ টা প্রতি কেজি

সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য = ৬০,০০০/-

সর্বনিম্ন লাভ (হেক্টর প্রতি) = (৬০,০০০ – ২৫,০০০)/-

= ৩৫,০০০/-

খরচ ও লাভের অনুপাত = ২৫:৩৫ = ১ : ১.৪ (প্রায়)

ব্যবহার ঃ

পাতা – নাক দিয়ে জল পড়া, ব্রঙ্কাইটিস, দাদ, চর্মরোগ, বাচ্চাদের পেটের গন্ডগোল, লিভারের সমস্যা ইত্যাদি রোগে উপকারী। বাচ্চাদের সর্দিকাশিতে পাতার রস মধু দিয়ে খাওয়ানো হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যেও এটি কার্যকর। ঠান্ডা লেগে জ্বর হলে পাতার রস আদা দিয়ে খাওয়ানো হয়। পোকামাকড় কামড়ালে ক্ষতস্থানে পাতার রস প্রয়োগ করা হয়, রক্তশোধক হিসাবেও এটি কার্যকর। পাতার রস দাঁতে উপকারী। মুখের বা শরীরের অন্য স্থানে দাগ মেলানোর জন্যেও এটি ব্যবহৃত হয়।

বীজ – মূত্র ও জননতন্ত্রের সমস্যায় এটি ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যায় বীজ ভেজানো জল হিতকর।

মূল – বোলতা বা মৌমাছির কামড়ে মূলের রস কার্যকর। জোঁক বা অন্যান্য কীটের কামড়েও এটি ব্যবহৃত হয়।

অনন্তমূল

বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Hemidesmus indicus*

ফ্যামিলি ঃ Asclepiadacea

বিস্তৃতি ঃ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ

বর্ণনা ঃ বহু শাখাযুক্ত লতানে বা শায়িত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কান্ড দাগযুক্ত, মসৃণ ও সরু। পাতা আয়তাকার ভল্লাকার মসৃণ। ফুলগুলি ছোট, কাক্ষিকভাবে প্রায় বৃন্তহীন অবস্থায় নিয়ত মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত থাকে। দলমন্ডল গোলাকার,

বাইরের দিক সবুজ, ভেতরটা গাঢ় বেগুনি রঙের। পরাগধানীর অগ্রভাগ যুক্ত, পরাগখন্ড জোড়া অবস্থায় সংযুক্ত থাকে। ফলগুলি দাগযুক্ত, মসৃণ, বীজগুলি কালো রঙের।

ফুল ও ফল আসার সময় ঃ সেপ্টেম্বর- ফেব্রুয়ারি

বাস্তুসংস্থান ঃ বনে-জঙ্গলে জন্মায়, প্রায়ই দেখা যায়।

বংশবিস্তার ঃ বীজের সাহায্যে

চাষ-আবাদ ঃ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে লাল কাঁকরযুক্ত বা লাল-দোআঁশ মাটিতে জন্মায়।

চারা তৈরির পদ্ধতি ঃ অনন্তমূলের মূলের অংশ কেটে নিয়ে এবং লতার কাটিং নিয়ে ভেজা বালিতে রেখে চারা করে নেওয়া যায়। বীজ থেকে চারা তৈরি করার সময় নার্সারিতে একভাগ মাটি, একভাগ গোবর সার, একভাগ বালি এবং কিছু পরিমাণ মিথাইল প্যারাথিয়ন ২ শতাংশ পাউডার মিশিয়ে পলিপট ভর্তি করা হয়। প্রতিটি পটে বীজ বুনে খড় চাপা দিতে হবে। এরপর নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

পুরোনো অথবা ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শাল বা নিম, অথবা মিশ্র প্রজাতির প্লান্টেশনের মধ্যে অনন্তমূলের ইন্টারক্রপিং খুব ভালো হয়। এতে চারা গাছ বাঁচার জন্য ছায়া এবং পেঁচিয়ে ওঠার অবলম্বন সহজে পেয়ে যায়। খোলা জায়গায় চাষ করতে হলে অবলম্বন হিসাবে একটি শক্ত কান্ডযুক্ত কোন ফসল যেমন

ওলট কম্বল, রেড়ি ইত্যাদির সাথে চাষ করলে অনন্তমূলের চারা ছায়া ও অবলম্বন দুই-ই পেয়ে যাবে। জমিতে অন্যান্য ফসলের লাইনের মাঝের জায়গায় বা প্লান্টেশনে গাছের লাইনের মাঝের জায়গায় গোবর সার ছড়িয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিস্কার করে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। তৈরি জমিতে ৪৫ থেকে ৬০ সেঃমিঃ ব্যবধানে লাইন ফেলে ১৫ সেঃ মিঃ গভীর খাদ করে নিয়ে ওই খাদে ৪৫ থেকে ৬০ সেঃ মিঃ ব্যবধানে জুলাই মাসে চারা লাগিয়ে দিতে হবে। অনন্তমূলের জন্য বিশেষ কোন সার বা সেচের প্রয়োজন হয় না। নার্সারিতে ২০ সেমি x ১০ সেমি পলিপটে চারা তৈরির খরচ পড়ে হাজার প্রতি ৪০০০ টাকা থেকে ৪৫০০ টাকা।

চারা লাগানোর দেড় থেকে দুই বছর পর শীতের শেষে দুপুর বেলায় মূল তুলে নিতে হবে। মূল পরিস্কার করে রোদে শুকনো করতে হবে।

ফলন ঃ এক হেক্টর অনন্তমূল চাষ করলে ১.২-১.৫ টন শুকনো অনন্তমূল

যৌথ ফসল চাষ

বৃক্ষজাতীয় ঔষধি উদ্ভিদের সাথে গুল্ম ও বীরুৎ জাতীয় ঔষধি গাছ আন্তঃ ফসল রূপেও আমরা চাষ করতে পারি।

সেক্ষেত্রে আমরা উভয় দিক থেকেই লাভবান হব। আমরা ঔষধি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ যেমন – হরিতকী, বহেড়া, অর্জুন, বেল ও আমলকী বাগানের সাথে আন্তঃফসল রূপে কালমেঘ, ঘৃতকুমারী,হলুদ, অনন্তমূল বা তুলসী চাষ করতে পারি।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ ১ হেক্টর হরিতকি বাগানের মধ্যে কালমেঘ যদি আমরা চাষ করতে চাই তা হলে —

তিনবছর বয়সের এক হেক্টর হরিতকি বাগান (তৈরীর পদ্ধতি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি) এর মাঝে ছোট পাওয়ার টিলার সাহায্যে বা কোদাল দিয়ে কেটে মাটি তৈরি করে। পরিমাণ মত জৈব সার / গোবর সার ছড়িয়ে জমি তৈরী করে নিতে পারি। এইবার কালমেঘের বীজ সরু বালি বা হাল্কা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ঐ তৈরি হওয়া জমিতে ছড়িয়ে দিতে পারি। তবে গাছের গোড়া থেকে ৬০ সেমি ছেড়ে বীজ ছড়ালে ভাল হয়।

এছাড়া আপনারা আলাদাভাবে কালমেঘের চারা নার্সারিতে তৈরী করেও গাছের গোড়া থেকে ৬০ সেমি ছেড়ে ১/২ মিটার অন্তর কালমেঘের চারা লাগিয়েও চাষ করতে পারেন। কালমেঘ চাষের পদ্ধতি আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে তিন বছর পর্যন্ত অর্থাৎ সাত বছর ধরে আমরা শুধু কালমেঘ চাষ করে যেমন লাভবান হব। ঠিক তেমনি এই হরিতকি বাগানের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন আমরা হরিতকি ফল ও কালমেঘ উভয় ফসল বিক্রি করে লাভবান হব।

যুগ্মভাবে চাষ থেকে আয় ও লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি)।

সর্বোচ্চ মোট খরচ

নার্সারিতে ২২০০ টি চারা তৈরীর জন্য খরচ	৮,০০০/-
বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	৪,০০০/-
তিনবছর পর অনন্তমূল আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করলে মোট খরচ	২৫,০০০/-
মোট খরচ	**১,৪৪,০০০/-**

তিন বছর পর অনন্তমূল থেকে আয় (যখন অনন্তমূল আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা হয়)— আন্তঃফসল হিসেবে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজি সর্বনিম্ন ফলন পাওয়া সম্ভব যার বাজারদর (শুকনো অনন্তমূল) ৬৫/- প্রতি কেজি। সুতরাং, হেক্টর প্রতি মোট আয় – (৫০০ x ৬৫) টাকা = ৩২,৫০০ টাকা।

৭বছর পর্যন্ত বেল বাগানে একমাত্র অনন্তমূল থেকে মোট আয় – (৩২,৫০০ x ৭) টাকা = ২,২৭,৫০০ টাকা।

দশম ও তার পরবর্তী বছরে বেল ও অনন্তমূল থেকে যৌথ আয় (হেক্টর প্রতি)–

বেলের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি সর্বনিম্ন ১২০টি ফল পাওয়া সম্ভব, যার বাজার মূল্য সর্বনিম্ন ৮টাকা প্রতি ফল। ১০ বছরে ৪০০ টি গাছ বাঁচানো সম্ভব হলে বেল থেকে মোট সর্বনিম্ন আয় –(৪০০ x ১২০ x ৮) টাকা = ৩,৮৪,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল হিসেবে অনন্তমূল থেকে তখন হেক্টর প্রতি প্রায় ১০০০ কেজি (সর্বনিম্ন) ফলন পাওয়া সম্ভব যার বাজারদর ৬৫/- প্রতি কেজি। সুতরাং, অনন্তমূল থেকে সর্বনিম্ন আয় – (১০০০ x ৬৫) টাকা = ৬৫,০০০ টাকা।

একইরকম ভাবে –

- বহেড়া বাগানের সাথে ঘৃতকুমারী
- অর্জুন বাগানের সাথে হলুদ
- বেলের সাথে অনন্তমূল
- আমলকীর সাথে তুলসী লাগিয়ে লাভবান হব।

এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে উপরিল্লিখিত বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদগুলি ও ঔষধী গুল্ম বা বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদগুলি কেউ কারোর উপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব অর্থাৎ উভক্ষতি প্রভাব (Allelopathic effect) ফেলে না। তাই সহজেই এগুলি আমরা গ্রাম বাংলায় চাষ করে লাভবান হতে পারি।

বহেড়া ও ঘৃতকুমারী (ঘৃতকুমারী আন্তঃফসল হিসেবে যখন চাষ করা হয়) যুগ্মভাবে চাষ থেকে আয় ও লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি)।

সর্বোচ্চ মোট খরচ

বহেড়া চারা (২২০০ টি) নার্সারিতে তৈরীর মোট খরচ	৮,০০০/-
চারা বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের মোট খরচ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	৪,০০০/-
তিনবছর পর বহেড়া বাগানে ঘৃতকুমারী আন্তঃফসল হিসেবে চাষের মোট খরচ	৭৮,৭৫০/-
মোট খরচ	**২,৬৯,৭৫০/-**

চার বছরের মাথায় ঘৃতকুমারী (যখন ঘৃতকুমারী আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা হবে) থেকে আয়—

আন্তঃফসল হিসেবে একবার ঘৃতকুমারী লাগিয়ে সর্বোচ্চ চারবার ফসল পেতে পারি। গড়ে সর্বনিম্ন ফলন ২০ টন প্রতি হেক্টর পাওয়া সম্ভব,

যার বাজার মূল্য ১৫০০০ টাকা প্রতি টন।

সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য – (১৫০০০ x ২০) টাকা = ৩,০৫,০০০ টাকা

দশম ও তার পরবর্তী বছরে আবার একবার ঘৃতকুমারী চাষ করলে বহেড়া ও অ্যালোভেরা থেকে যৌথ আয়—

সর্বনিম্ন হেক্টর প্রতি ৪০০ টি বহেড়া গাছ বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু ২৫ কেজি সর্বনিম্ন ফল পাওয়া সম্ভব যার বাজার দর ৩০ টাকা প্রতি কেজি। সুতরাং বহেড়া থেকে মোট সর্বনিম্ন আয় – (৪০০ x ২৫ x ৩০) টাকা = ৩,০০,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল হিসেবে ঘৃতকুমারী থেকে তখন প্রায় ২৫ টন প্রতি হেক্টর ফলন পাওয়া সম্ভব, যার বাজার মূল্য ১৫০০০/- প্রতি টন। সুতরাং ঘৃতকুমারী থেকে মোট সর্বনিম্ন আয় – (২৫ x ১৫০০০) টাকা = ৩,৭৫,০০০ টাকা।

দশম ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে হেক্টর প্রতি মোট আয় – (৩,০০,০০০ + ৩,৭৫,০০০) = ৬,৭৫,০০০/-

পূর্ব হিসাব অনুযায়ী সর্বোচ্চ মোট খরচ = ২,৬৯,৭৫০/-

সুতরাং, মোট লাভ – (৬,৭৫,০০০ – ২,৬৯,৭৫০) = ৪,০৫,২৫০

খরচ ও লাভের অনুপাত = ২৬৯৭৫০:৪০৫২৫০

= ১:১.৫

বেল ও অনন্তমূল (অনন্তমূল আন্তঃফসল হিসেবে যখন চাষ করা হয়)

দশম ও পরবর্তী বছরগুলোয় হেক্টর প্রতি মোট আয় – (৩,৮৪,০০০+৬৫,০০০) টাকা = ৪,৪৯,০০০ টাকা।

পূর্ব হিসাব অনুযায়ী সর্বোচ্চ মোট খরচ = ১,৪৪,০০০ টাকা।

সুতরাং মোট লাভ = (৪,৪৯,০০০ – ১,৪৪,০০০) টাকা = ৩,০৫,০০০ টাকা।

খরচ ও লাভের অনুপাত = ১৩৯:৩০৫

= ১:২.২ (প্রায়)

অর্জুন ও হলুদ (হলুদ আন্তঃফসল হিসেবে যখন চাষ করা হয়) যুগ্মভাবে চাষ থেকে আয় ও লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি)।

সর্বোচ্চ মোট খরচ

নার্সারিতে ২২০০ টি চারা তৈরীর খরচ	৮,০০০/-
বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	৪,০০০/-
আন্তঃফসল হিসাবে চাষের সর্বোচ্চ খরচ	৪৭,০০০/-
মোট খরচ	**১,৬৬,০০০/-**

তিন বছর পর হলুদ থেকে আয় (হলুদ যখন আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করা হবে) —

আন্তঃফসল হিসাবে সর্বনিম্ন ফলন হেক্টর প্রতি ২০ কুইঃ যার সর্বনিম্ন বাজার মূল্য ৬০০০/- টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল।

সুতরাং মোট আয় (হেক্টর প্রতি) = (২০ x ৬০০০) টাকা = ১,২০,০০০ টাকা।

সাত বছর পর্যন্ত অর্জুন বাগানে একমাত্র হলুদ থেকে মোট আয় =

সর্বোচ্চ মোট খরচ

হরিতকী চারা (২২০০) নার্সারিতে তৈরীর খরচ	৮,০০০/-
বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	৪,০০০/-
তিন বছর পর হরিতকী বাগানে কালমেঘ বীজ ছড়িয়ে আন্তঃফসল চাষের খরচ	২৫,০০০/-
মোট খরচ	১,৪৪,০০০/-

তিন বছরের পর কালমেঘ থেকে আয় (কালমেঘ যখন আন্তঃফসল রূপে আমলকীর সঙ্গে চাষ করা হবে) –

আন্তঃফসল হিসাবে ২০০০ কেজি (সর্বনিম্ন ফলন) হেক্টর প্রতি শুকনো কালমেঘ পাওয়া সম্ভব যার বাজার দর ৩০/- প্রতি কেজি।

সুতরাং মোট আয় (হেক্টর প্রতি) = (২০০০ x ৩০) টাকা = ৬০,০০০ টাকা।

৭ বছর পর্যন্ত হরিতকি বাগানে একমাত্র কালমেঘ থেকে মোট আয় = (৬০,০০০ x ৭) টাকা = ৪,২০,০০০ টাকা।

দশম ও তার পরবর্তী বছরে হরিতকি ও কালমেঘ থেকে যৌথ আয় –

সর্বনিম্ন হেক্টর প্রতি ৪০০ টি হরিতকি গাছ বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ২৫ কেজি ফল পাওয়া যাবে। যার সর্বনিম্ন বাজার দর ৩০ টাকা প্রতি কেজি।

সুতরাং হরিতকি থেকে সর্বনিম্ন মোট আয় – (৪০০ x ২৫ x ৩০) টাকা = ৩,০০,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল হিসাবে কালমেঘ থেকে তখন আয় প্রায় ২২০০ কেজি ফলন (হেক্টর প্রতি) পাওয়া সম্ভব যার বাজার মূল্য ৩০ টাকা প্রতি কেজি।

(১,২০,০০০ x ৭) টাকা = ৮,৪০,০০০ টাকা।

দশম ও তার পরবর্তী বছরে হলুদ ও অর্জুন থেকে যৌথ আয় –

সর্বনিম্ন হেক্টর প্রতি ২০০ টি গাছ বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ১ কেজি ছাল পাওয়া যাবে, যার সর্বনিম্ন বাজার দর ৫০০ টাকা প্রতি কেজি।

সর্বনিম্ন মোট আয় – (৪০০ x ১ x ৫০০) টাকা = ২,০০,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল হিসাবে হলুদ চাষ করলে আয় = ১,২০,০০০ টাকা।

সুতরাং দশম ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে হেক্টর প্রতি মোট আয় = (২,০০,০০০+১,২০,০০০)= ৩,২০,০০০ টাকা।

পূর্ব হিসাব অনুযায়ী সর্বোচ্চ মোট খরচ = ১,৬৬,০০০ টাকা

সুতরাং খরচ ও লাভের অনুপাত = ১৬৬ : ৩২০ = ১:২ (প্রায়)

আমলকি ও তুলসী (তুলসী আন্তঃফসল হিসেবে যখন চাষ করা হয়) যুগ্মভাবে চাষ থেকে আয় ও লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি)।

সর্বোচ্চ মোট খরচ

নার্সারিতে ২২০০ টি চারা তৈরীর খরচ	৮,০০০/-
বাগানে চারা লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ	৮৫,০০০/-
প্রথম বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১২,০০০/-
দ্বিতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	১০,০০০/-
তৃতীয় বছর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ	৪,০০০/-
তিন বছর পর আমলকী বাগানে তুলসী চাষের খরচ	২৫,০০০/-
মোট খরচ	**১,৪৪,০০০/-**

তিন বছরের মাথায় তুলসী যখন আন্তঃফসল রূপে আমলকীর সঙ্গে চাষ করা হবে তখন আয় –

আন্তঃফসল হিসাবে ৫ টন (সর্বনিম্ন ফলন) হেক্টর প্রতি ডালপালা পাতা সহ তুলসী পাওয়া সম্ভব যার বাজার দর ১৫ .০০ টাকা প্রতি কেজি।

সুতরাং মোট আয় (হেক্টর প্রতি) = (৫০০০ x ১৫) টাকা = ৭৫,০০০ টাকা।

৭ বছর পর্যন্ত আমলকি বাগানে একমাত্র তুলসী থেকে মোট আয় = (১,২০,০০০ x ৭) টাকা = ৮,৪০,০০০ টাকা।

দশম ও তার পরবর্তী বছরে আমলকি ও তুলসী থেকে যৌথ আয় –

সর্বনিম্ন হেক্টর প্রতি ৬০০ টি আমলকি গাছ বাঁচানো সম্ভব হলে গাছ পিছু সর্বনিম্ন ৪ কেজি ফল পাওয়া যাবে, যার সর্বনিম্ন বাজার দর ১০০ টাকা প্রতি কেজি।

সুতরাং আমলকি থেকে সর্বনিম্ন মোট আয় – (৬০০ x ৪ x ১০০) টাকা = ২,৪০,০০০ টাকা।

আন্তঃফসল হিসাবে তখন তুলসী থেকে আয় ৬ টন (প্রতি হেক্টর), যার বাজার মূল্য ১৫ টাকা প্রতি কেজি।

আন্তঃফসল হিসাবে তুলসী থেকে আয়= ৬০০০x ১৫=৯০,০০০/-

সুতরাং দশম ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে হেক্টর প্রতি মোট আয় = (২,৪০,০০০+৯০,০০০)= ৩,৩০,০০০ টাকা।

পূর্ব হিসাব অনুযায়ী সর্বোচ্চ মোট খরচ = ১,৪৪,০০০ টাকা।

সুতরাং মোট লাভ = (৩,৩০,০০০ – ১,৪৪,০০০) = ১,৮৬,০০০ টাকা।

খরচ ও লাভের অনুপাত = ১৪৪ : ১৮৬

= ১ : ১.৩ (প্রায়)

হরিতকী ও কালমেঘ (কালমেঘ আন্তঃফসল হিসেবে যখন চাষ করা হয়) যুগ্মভাবে চাষ থেকে আয় ও লাভের হিসেব (হেক্টর প্রতি)।

সুতরাং কালমেঘ থেকে সর্বনিম্ন মোট আয় – (২২০০ x ৩০) টাকা = ৬৬,০০০ টাকা।

দশম ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে হেক্টর প্রতি মোট আয় = (৩,০০,০০০ + ৬৬,০০০) টাকা = ৩,৬৬,০০০ টাকা।

পূর্ব হিসাব অনুযায়ী সর্বোচ্চ মোট খরচ = ১,৪৪,০০০ টাকা।

সুতরাং মোট লাভ = (৩,৬৬,০০০ – ১,৪৪,০০০) = ২,২২,০০০ টাকা।

খরচ ও লাভের অনুপাত = ১৪৪ : ২২২ = ১ : ১.৫

এভাবে অন্যান্য পছন্দমত যৌথ ফসল চাষ করা সম্ভব। যেহেতু বৃক্ষজাতীয় ভেষজ উদ্ভিদের লতা-গুল্ম জাতীয় ঔষধির উপর কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব নেই, সেইজন্য সুবিধামত ফসল নির্বাচন করে চাষের অগ্রগতি অনায়াসেই করা যেতে পারে।

তথ্যপঞ্জী

অসীমা চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), ১৯৭৩-৭৭

ভারতীয় বনৌষধি ঃ ১-৬ খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য (১৪০৬ সন)

চিরঞ্জীব বনৌষধি ঃ ১-১১ খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ,
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

গবেষণা মণ্ডল, বন দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত

দক্ষিণবঙ্গের ভেষজ উদ্ভিদ সম্পদ
মার্চ, ২০১৮, প্রথম মুদ্রণ

গবেষণা মণ্ডল, বন দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত

ভেষজ উদ্ভিদের নার্সারি ও সৃজন পদ্ধতি
২০০৬, প্রথম মুদ্রণ

কৃষি বাতায়ণ, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত

আন্তর্জাল (krishi.gov.bd)